অক্টোবর ২০১৭ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

ছড়া ও কবিতায় শেখ রাসেল

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অগ্রযাত্রা

রোহিঙ্গা সমস্যা : আনান কমিশন রিপোর্ট

উন্নয়ন ও সাফল্যের মহাসড়কে দিনাজপুর জেলা

সাক্ষাৎকার : অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

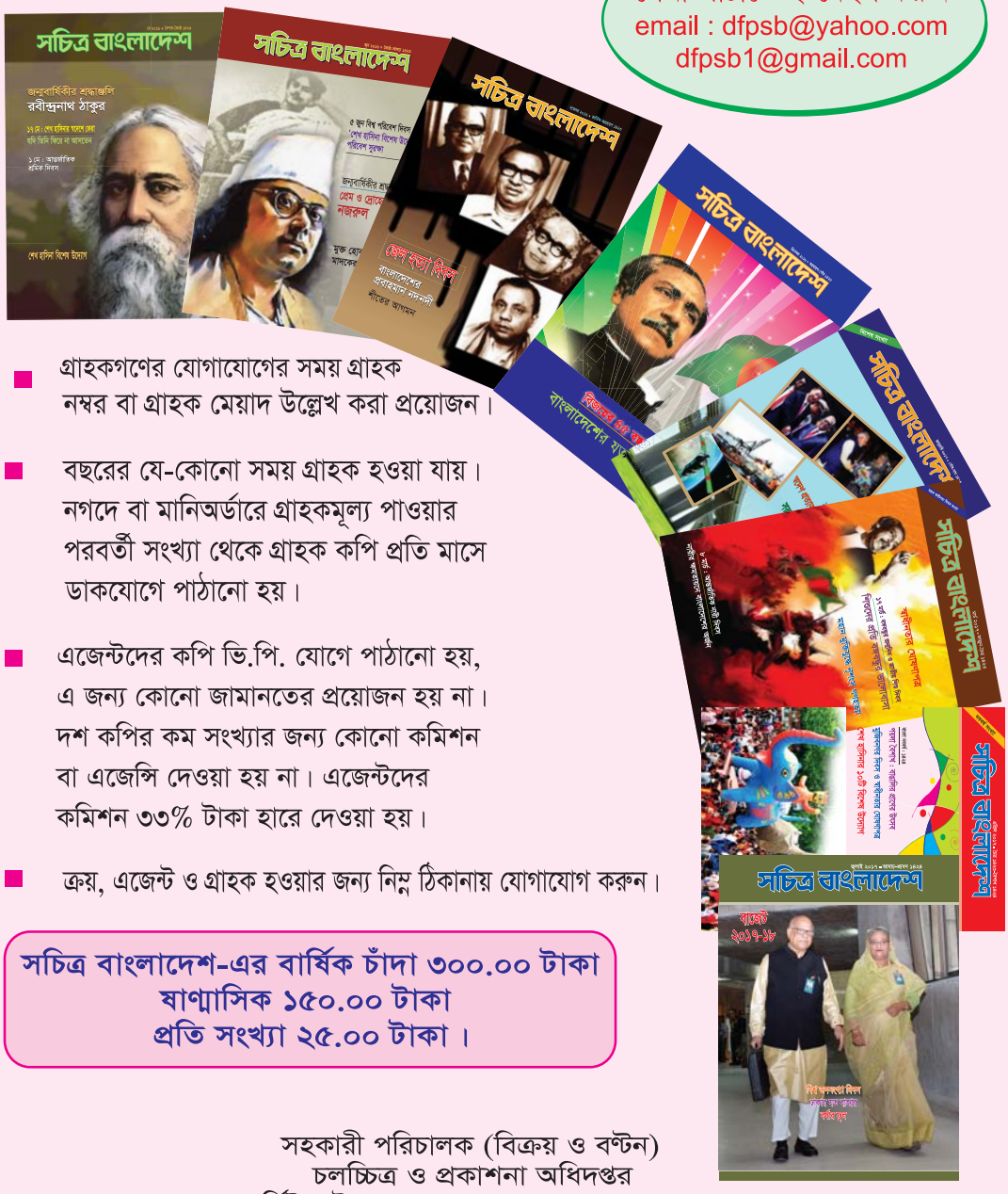

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০১৭ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৪

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, শেখ কামাল ও শেখ জামাল সহ পরিবারের সদস্যদের সাথে শেখ রাসেল

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান নৃশংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে সীমান্ত অতিক্রম করে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ক্রমাগত অনুপ্রবেশের চিত্র তুলে ধরেন এবং এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। সহিংসতা ও জাতিগত নিধন বন্ধ করে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে উত্থাপন করেন এবং 'জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ তহবিল'-এ ১ লাখ মার্কিন ডলার প্রতীকী অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন। তাঁর এই ভাষণ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে বহুল প্রশংসিত হয়েছে এবং তাঁর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পাঠকদের জন্য ভাষণটি এ সংখ্যায় ছাপানো হলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ সন্তান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ রাসেলের জন্মদিন ১৮ই অক্টোবর। আর এ অক্টোবর মাসেই পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস। মাত্র ১১ বছর বয়সে চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেল পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের কালরাতে নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। নিষ্পাপ রাসেল বঞ্চিত হয়েছে শিশু অধিকার থেকে, হয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও বঞ্চিত। শিশু রাসেল তাই অধিকারহারা ও মানবাধিকার বঞ্চিত শিশুদের প্রতীক হয়ে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে। বিশ্ব শিশু দিবসের প্রাক্কালে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। বিশ্ব শিশু দিবস ও শেখ রাসেলকে নিয়ে দুটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এ সংখ্যায়।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নতুন করে জাতিগত সহিংসতার শিকার হয়েছে এবং বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের প্রায় ৮ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা নাগরিক ইতোমধ্যে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে গঠিত ৯ সদস্যের কমিশন ২৪শে আগস্ট ২০১৭ মোট ৮৮টি সুপারিশ সংবলিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। আনান কমিশন রিপোর্টসহ রোহিঙ্গা সমস্যার ওপর ভিত্তি করে দুটি বিশেষ নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য সরকার সারাদেশের সুষম উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। দুই মেয়াদে সরকার ইতোমধ্যে সাড়ে ৮ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এসেছে। বর্তমান সরকার ২০১১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর স্বতন্ত্র রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক সাফল্যের প্রতিবেদন প্রকাশের অংশ হিসেবে এবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের ওপর নিবন্ধ প্রকাশ করা হলো। পাশাপাশি এবারের সংখ্যায় দিনাজপুর জেলার উন্নয়ন ও সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এ প্রথমবারের মতো জেলাভিত্তিক উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশের সূচনা হলো।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর পূর্বগামী সাময়িকী *মাহে-নও* এবং *বাংলাদেশ সংবাদ*। শিকড় সন্ধানের প্রয়াসে এবার *মাহে-নও*-এর ওপর একটি গবেষণাধর্মী নিবন্ধ প্রকাশ করা হলো। এছাড়া আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসসহ নানা বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, এসডিজি নিবন্ধ, গল্প ও কবিতায় সাজানো হয়েছে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*।

এছাড়া রয়েছে নিয়মিত প্রতিবেদন । আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক**
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪
রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সমর্থন ৭
আহমদ রফিক
বিশ্ব শিশু দিবস ও শেখ রাসেলের জন্মদিন ৯
খালেক বিন জয়েনউদদীন
রোহিঙ্গা সমস্যা : আনান কমিশনের রিপোর্ট ১০
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অগ্রযাত্রা ১৬
কমল চৌধুরী
উন্নয়ন ও সাফল্যের মহাসড়কে দিনাজপুর জেলা ২০
মীর খায়রুল আলম
আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ৩৩
বরুণ দাস
সচিত্র বাংলাদেশ-এর পূর্বসূরি 'মাহে-নও' ৩৪
ড. শিল্পী ভদ্র
ছড়া-কবিতায় শেখ রাসেল ৩৬
উৎপলকান্তি বড়ুয়া
শারদীয় দুর্গোৎসব ৩৯
প্রসেনজিৎ কুমার দে
সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প ৪০
জাকির হোসেন চৌধুরী
অটিজম সমস্যা ও আমাদের করণীয় ৪১
পারভীন আক্তার লাভলী
নারীই গড়বে বাসযোগ্য পৃথিবী ৪২
আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা
নারীর অগ্রযাত্রায় প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা ৪৩
জান্নাতে রোজী

একান্ত সাক্ষাৎকার
অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ ৪৪
এম এ খালেক
আব্দুল জব্বার : বাংলা গানের কিংবদন্তির প্রয়াণ ৪৬
সুলতানা বেগম
খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশের সাফল্য ৪৭
শারমিন সুলতানা শান্তা

বিশেষ প্রতিবেদন
সরকারি হলো বিরামপুর কলেজ ৫৩
ডা. নূরুল হক
দিনাজপুরে পাঠক-লেখকদের আড্ডা এবং গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় ৫৪
মো. সাদ্দাম হোসেন

হাইলাইটস

গল্প

গগন যখন গেরিলা ৪৮
মানজুর মুহাম্মদ

কবিতাগুচ্ছ ৫০-৫২

মোশাররফ হোসেন ভূঞা, বাতেন বাহার, কনক চৌধুরী, আমিরুল হক, মনসুর জোয়ারদার, শাফিকুর রাহী, লিলি হক, জাকির হোসেন চৌধুরী, সাঈদ তপু, মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ, আবু সাঈদ সিদ্দিকী, রোকসানা গুলশান, খান চমন-ই-এলাহি, গোলাম নবী পান্না, আনসার আনন্দ, ফরিদ আহমেদ হৃদয়, খাইরুল ইসলাম তাজ, বশিরুজ্জামান বশির, কবির আহমেদ, তাহমিনা, জহিরুল হক

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫৫
প্রধানমন্ত্রী ৫৫
তথ্যমন্ত্রী ৫৭
জাতীয় ঘটনা ৫৭
আমাদের স্বাধীনতা ৫৭
উন্নয়ন ৫৮
আন্তর্জাতিক ৫৮
শিক্ষা ৫৯
প্রতিবন্ধী ৫৯
শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ ৫৯
স্বাস্থ্যকথা ৬০
যোগাযোগ ৬০
সংস্কৃতি ৬০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬০
কৃষি ৬০
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬১
জেন্ডার ও নারী ৬১
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৬২
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
নিরাপদ সড়ক ৬৩
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬৩
সামাজিক নিরাপত্তা ৬৩
শিল্প-বাণিজ্য ৬৩
মাদক প্রতিরোধ ৬৪
চলচ্চিত্র ৬৪
ক্রীড়া ৬৪

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দেন। এটি সাধারণ পরিষদে তাঁর চতুর্দশতম ভাষণ। ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন– মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান নৃশংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থার ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং সমস্যা সমাধানে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণের বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪।

উন্নয়ন ও সাফল্যের মহাসড়কে দিনাজপুর জেলা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য সরকার সারাদেশের সুষম উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ বিকাশ, জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে বেগবান করার প্রচেষ্টা চলছে। তাই জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামগুলোকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার প্রচেষ্টা দেশজুড়ে দৃশ্যমান। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তবর্তী জেলা দিনাজপুরের জনগণ সরকারি এ নীতির অন্যতম সুফলভোগী। বিগত সাড়ে আট বছরে এ জেলার ১৩টি উপজেলার ১০৩টি ইউনিয়নে ডিজিটালাইজেশনসহ ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। চালু হয়েছে জেলার দ্বিতীয় স্থলবন্দর বিরল। সদর ও হাকিমপুর উপজেলা শতভাগ বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এসেছে। সরকারি উন্নয়ন পরিক্রমায় জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশের ধারাবাহিকতায় দিনাজপুর জেলার উন্নয়ন ও সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর প্রথম বিশেষ নিবন্ধটি পড়ুন, পৃষ্ঠা-২০।

ছড়া-কবিতায় শেখ রাসেল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল। ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ রাসেল ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। ফুলের মতো সহজ-সরল-সুন্দর এই শিশু বাংলাদেশের সকল শিশুর প্রতিনিধি। স্বপ্নিল সুন্দর সম্ভাবনার নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেল মাত্র ১১ বছর বয়সে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের কালরাতে নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। এ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী ও বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষ ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের কবি-ছড়াকারগণ ছন্দিত প্রয়োগে নন্দিত উপস্থাপনার ডালা সাজিয়ে এই প্রতিবাদে নিজেদের সম্পৃক্ত করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৩৬।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অগ্রযাত্রা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০১১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর স্বতন্ত্র রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। সাশ্রয়ী ও আরামপ্রদ গণপরিবহণ হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুরু হয় ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ। মাত্র ৫৩.১১ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন চালুর মধ্য দিয়ে ১৮৬২ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে নামে এদেশে যে রেলওয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, বাংলাদেশ রেলওয়েতে তা এখন ২৮৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এক বিশাল নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। সরকারের বিগত সাড়ে ৮ বছরে রেলওয়ের উন্নয়নে ৬৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ, ৫৩টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন এবং ১০৪টি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। রেলওয়ের বহরে যুক্ত হয়েছে নতুন ইঞ্জিন, বগি ও নতুন ট্রেন। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের ভিত্তিতে কমল চৌধুরীর রচিত নিবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-১৬।

রোহিঙ্গা সমস্যা : আনান কমিশন রিপোর্ট

মিয়ানমারের বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্য রাখাইনে বছরের পর বছর রোহিঙ্গারা নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। সেখানে ছড়াচ্ছে সহিংসতা, ক্ষতিগ্রস্ত ও বাস্তুচ্যুত হচ্ছে হাজার হাজার নারী ও শিশু। বার বার সহিংসতায় উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে, আসছে; কিন্তু বিষয়টির স্থায়ী সমাধান হয়নি। সংকট নিরসনে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন ২৪শে আগস্ট ২০১৭ রিপোর্ট প্রদান করে, যাতে ৮৮টি সুপারিশ রয়েছে। আনান কমিশন রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রচিত বিশেষ নিবন্ধটি পড়ুন, পৃষ্ঠা-১০।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

জাতিসংঘ সদর দপ্তর, নিউইয়র্ক, ২১ শে সেপ্টেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম এবং Good Afternoon/ Evening.

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাকে আন্তরিক ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার দায়িত্ব পালনে আমার প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি। মানবকল্যাণ, শান্তি ও টেকসই ধরিত্রী– আপনার এই তিন প্রাধিকারের প্রতি আমার অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করছি।

জনাব সভাপতি,

সাধারণ পরিষদের এই মহান অধিবেশনে বক্তব্য দিতে আমি চতুর্দশবারের মতো উপস্থিত হয়েছি। তবে আমার হৃদয় আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত। কেননা আমার চোখে বার বার ভেসে উঠছে ক্ষুধার্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের মুখচ্ছবি। আমি মাত্র কয়েকদিন আগেই আমার দেশে আশ্রয় নেওয়া কয়েক লাখ রোহিঙ্গার সঙ্গে দেখা করে এসেছি, যারা 'জাতিগত নিধনে'র শিকার হয়ে আজ নিজ দেশ থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত। অথচ তারা হাজার বছরেরও অধিক সময় যাবৎ মিয়ানমারে বসবাস করে আসছেন।

এদের দুঃখ-দুর্দশা আমি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আমার বাবা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করার পর আমি আমার ছোটো বোনকে নিয়ে ৬ বছর উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়েছি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের হয়ে প্রথমবারের মতো এখানে ভাষণ দেওয়ার সময় এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে তাঁর অঙ্গীকারের কথা বলে গেছেন।

সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন: 'এমন এক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গীকৃত, যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে এবং আমি জানি, আমাদের এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মধ্যে আমাদের লাখ লাখ শহিদের বিদেহী আত্মার স্মৃতি নিহিত রয়েছে'।

জনাব সভাপতি,

আমরা এই মুহূর্তে নিজ ভূখণ্ড হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত ৮ লাখেরও অধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় ও সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা সকলেই জানেন যে, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান নৃশংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে বাংলাদেশ–মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থার ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। এই নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার রোহিঙ্গা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য মতে, গত তিন সপ্তাহে চার লাখ ত্রিশ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত যাওয়া ঠেকানোর জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সীমানা বরাবর স্থলমাইন পুঁতে রাখছে। এতে আমরা ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এসব মানুষ যাতে নিরাপদে এবং মর্যাদার সঙ্গে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন এখনই তার ব্যবস্থা করতে হবে।

একই সঙ্গে আমি সব ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছি। এ বিষয়ে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলে।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সহিংসতা বন্ধে এবং ঐ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও জাতিসংঘের মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমি কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করছি।

প্রথমত, অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও 'জাতিগত নিধন' নিঃশর্তে বন্ধ করা;

দ্বিতীয়ত, অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল (Fact Finding Mission) প্রেরণ করা;

তৃতীয়ত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা এবং এলক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় (safe zones) গড়ে তোলা;

চতুর্থত, রাখাইন রাজ্য হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা;

পঞ্চমত, কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

জনাব সভাপতি,

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ভয়াবহতম গণহত্যার শিকার হয়। ৯ মাসব্যাপী চলা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী ৩০ লাখ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে এবং ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে চিহ্নিত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তারা এই হত্যাযজ্ঞ চালায়।

বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করতে তারা দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে।

গণহত্যার শিকার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সম্প্রতি ২৫শে মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। মূলত ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতেই 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মাধ্যমে তারা এই গণহত্যার সূচনা করেছিল।

এই গণহত্যার সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্তদের আমরা ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করেছি।

বিশ্বের কোথাও যাতে কখনই আর এ ধরনের জঘন্য অপরাধ সংঘটিত না হয়, সেজন্য আমি বিশ্ব সম্প্রদায়কে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, '৭১-এর গণহত্যাসহ সকল ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমাদের এ লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন – পিআইডি

জনাব সভাপতি,

স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই আমরা শান্তি-কেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চলেছি। এ উপলব্ধি থেকেই সাধারণ পরিষদে ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছর 'শান্তির সংস্কৃতি' (culture of peace) শীর্ষক প্রস্তাব পেশ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করা এবং ভ্রাতৃপ্রতিম ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য এবং শত্রুতা নিরসনের জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা আশা করি, শান্তি বিনির্মাণে জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। এলক্ষ্যে 'অব্যাহত শান্তি'র জন্য অর্থায়ন বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছ থেকে আমরা সাহসী এবং উদ্ভাবনমূলক প্রস্তাব প্রত্যাশা করছি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে 'জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ তহবিল'-এ আমি ১ লাখ মার্কিন ডলার প্রতীকী অনুদান প্রদানের ঘোষণা দিচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যতম সেনা ও পুলিশ সদস্য প্রদানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনসমূহের কার্যকারিতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সমুন্নত রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

এক্ষেত্রে আমরা আমাদের নিজস্ব প্রস্তুতি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বজায় রেখে চলছি। যে-কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক অঙ্গীকার প্রদান, শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যায় নারী শান্তিরক্ষী মোতায়েনে আমরা সদা প্রস্তুত রয়েছি।

এ প্রেক্ষাপটে 'যৌন নিপীড়ন' সংক্রান্ত যে-কোনো অভিযোগের বিষয়ে আমরা 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলি। আমাদের এই নীতির প্রতিফলন হিসেবে আমরা জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত 'যৌন নিপীড়ন' সংক্রান্ত Voluntary Compact-এ সমর্থন প্রদান করেছি। 'যৌন নিপীড়ন' সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় আমি মহাসচিবের 'সার্কেল অব লিডারশিপ'-এর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

এছাড়া, এ বিষয়ে গঠিত 'ভিকটিম সাপোর্ট তহবিল' প্রতীকী অনুদান হিসেবে আমি এক লাখ মার্কিন ডলার অনুদানের ঘোষণা দিচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

সন্ত্রাসবাদ এবং সহিংস জঙ্গিবাদ শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি। একজন সন্ত্রাসীর কোনো ধর্ম, বর্ণ বা গোত্র নেই। আমি নিজে বেশ কয়েকবার সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছি। সে হিসেবে আমি সন্ত্রাসের শিকার মানুষের প্রতি আমার সহানুভূতি প্রকাশ করছি। আমি মনে করি তাঁদের সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

আমরা ধর্মের নামে যে-কোনো সহিংস জঙ্গিবাদের নিন্দা জানাই। সহিংস জঙ্গিবাদ বিস্তার রোধে তৃণমূল পর্যায়ে আমরা পরিবার, নারী, যুবসমাজ, গণমাধ্যম এবং ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করেছি। বৈশ্বিক এ সমস্যা মোকাবিলায় আমার প্রস্তাব হচ্ছে:

এক. সন্ত্রাসীদের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে হবে;

দুই. সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বন্ধ করতে হবে; এবং

তিন. শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করতে হবে ।

অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধের ক্ষেত্রে সাইবার জগৎ থেকে উদ্ভূত হুমকি মোকাবিলা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে আমি জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশ নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত অভিবাসনকে উৎসাহিত করে। Global Compact on safe orderly and regular migration-এর মাধ্যমে একটি সুস্থ ধারার অভিবাসন-কাঠামো তৈরির জন্য গত বছর আমরা একটি প্রস্তাব পেশ করেছি।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আজ অভিবাসন এবং উদ্বাস্তু সংক্রান্ত Compact গঠনের বিষয়ে জাতিসংঘে আলোচনা চলছে ।

জনাব সভাপতি,

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে আমরা আশাবাদী। জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু সংবেদনশীলতার দিকে লক্ষ রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় আমরা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে 'ব্লু ইকনোমি'র সম্ভাবনার প্রতি আমরা আস্থাশীল।

বাংলাদেশ বন্যা এবং অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলায় দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য দেখিয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা শস্য-নিবিড়করণ প্রযুক্তি এবং বন্যা-প্রতিরোধী ফসলের জাত উদ্ভাবন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে SDG Implementation, Financing and Monitoring : Sharing Innovations through South-South and Triangular Cooperation *শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের পার্শ্ব বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন – পিআইডি*

করেছি। এ বছর বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে যে ব্যাপক বন্যা আঘাত হেনেছে আমরা তা সফলভাবে মোকাবিলা করেছি।

পানি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের সদস্য হিসেবে আমি এ সংক্রান্ত 'সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করছি। ২০১৫ সালের মধ্যে আমরা আমাদের ৮৭ শতাংশ নাগরিকের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগ জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় আনা হবে।

জনাব সভাপতি,

আমরা মনে করি, শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা এবং বেকারত্ব দূর করা অত্যন্ত জরুরি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। এক্ষেত্রে আমাদের সরকার সমাজের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নীতি গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে রূপান্তরের যে রূপকল্প আমরা হাতে নিয়েছি, এসডিজি তারই পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।

মূলত এসডিজি গ্রহণের অনেক আগে থেকেই আমরা বেশকিছু কর্মসূচি এবং সামাজিক নীতি বাস্তবায়ন শুরু করেছি, যা পরবর্তীকালে এসডিজি'তেও প্রতিফলিত হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে– একটি বাড়ি একটি খামার, কমিউনিটি ক্লিনিক, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, সবার জন্য শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বিনিয়োগ ও উন্নয়ন।

এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি এবং অঙ্গীকারের বিষয়গুলো আমরা এ বছর জাতিসংঘে 'ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ'-এর মাধ্যমে তুলে ধরেছি ।

জনাব সভাপতি,

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৬ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে ৩২.১ বিলিয়ন ডলার। দারিদ্র্যের হার ১৯৯১ সালের ৫৬.৭ শতাংশ হতে কমে বর্তমানে ২৩.২ শতাংশ হয়েছে।

মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ হাজার ৬০২ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে। এ সকল সূচক মূলত আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নকেই নির্দেশ করে ।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সকলের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে আমরা সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি।

ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় আমরা সমাজের সবচেয়ে অসহায় ব্যক্তি, যেমন– বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারী এবং আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্তদের সহায়তা করছি। শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে বিশেষ গুরত্ব দেওয়া হচ্ছে। অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য ১০৩টি সেবাকেন্দ্র এবং ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যান কাজ করছে।

তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল হতে মোবাইল ফোন ও ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিটি গ্রামে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৩৮ হাজার ৩৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। যুবসমাজকে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জনাব সভাপতি,

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে আমাদের যুবসমাজ মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। আমরা এমন একটি পরিবেশ তৈরির জন্য কাজ করছি যেখানে তারা যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে এবং প্রকৃত অর্থেই বিশ্বনাগরিকে পরিণত হবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করতে চাই যে, এ বছরের মধ্যেই আমরা প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করার পরিকল্পনা নিয়েছি।

জনাব সভাপতি,

সবশেষে আমি বলতে চাই, আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি চাই। মানব ধ্বংস নয়, মানবকল্যাণ চাই। এটাই হোক আমাদের সকলের লক্ষ্য।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

সৌজন্যে: তথ্য অধিদফতর

STOP MUSLIM GENOCIDE IN MAYANMAR

বিশেষ নিবন্ধ

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সমর্থন

আহমদ রফিক

মিয়ানমারের রাখাইন (পূর্ব নাম আরাকান) অঞ্চলে সেখানকার সামরিক জান্তা ও গণতন্ত্রী নামে পরিচিত অং সান সু চির সরকার রোহিঙ্গাদের ওপর যে অবিশ্বাস্য হামলা চালাতে সাহায্য করছে, এ পর্যায়ে তা গণহত্যারও অধিক। রাখাইনের উগ্রপন্থি বৌদ্ধরা তাদের অহিংস ধর্ম ভুলে কী কারণে এ মারমুখী সহিংসতা চালাচ্ছে, তা বোঝা খুব একটা কঠিন নয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ যে নারকীয় হিংস্রতার জন্ম দেয়, বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তার বিস্তর নজির বিদ্যমান। খুব পরিচিত উদাহরণ– গত শতকে হিটলার-মুসোলিনি-তোজোর শাসন।

বহুভাষী-বহুজাতিসত্তা অধ্যুষিত একদা ব্রহ্মদেশে (ইংরেজ আমলের বার্মায়) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লক্ষ্য জাতিগত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বা স্বাধীনতা অর্জন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল নানা মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ও পরিণামে সংঘাত। হানাহানিও কম ছিল না। এর মধ্যে সমঝোতার আবহ সৃষ্টি করতে চেষ্টা চালান বামপন্থি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা আউঙ সান (বর্তমানে অং সান নামে পরিচিত)।

দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে নানামাত্রিক চুক্তি ও সমঝোতার ওপর নির্ভর করে অশান্তির আগুন নেভানোর চেষ্টায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন আউঙ সান। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের হিংস্রতায় শেষ পর্যন্ত তাকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়। বার্মা ক্রমে সামরিক নেতাদের শাসনে চলে আসে। প্রায় ২৫ বছরের অধিকাল ধরে চলেছে সামরিক শাসন। চীনের সঙ্গে এদের মৈত্রীর সম্পর্ক, বিরোধিতা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে।

ইঙ্গ–মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এ সময় আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে গণতান্ত্রিক শাসনের নামে বার্মায় শক্তির আধিপত্য বিস্তার করতে। এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য রাজনৈতিক। কারণ, বার্মা–চীন মৈত্রী সম্পর্ক। দ্বিতীয় লক্ষ্য বার্মার ভূগর্ভে নিহিত বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ, জৈব জ্বালানি। ব্যর্থ সাম্রাজ্যবাদীরা অবশেষে আউঙ সান-কন্যা সু চিকে মূল শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করায় তাকে ক্ষমতায় বসাতে।

সুচি আউঙ সান-কন্যা হলেও পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতির ভক্ত। ব্যক্তিগত জীবন ও জীবনাচরণ সেই ধারায় বাঁধা। তার আপ্রাণ চেষ্টা বার্মায় গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা। নিজেই সেই ব্যবস্থার নায়িকা হয়ে ওঠা তার স্বপ্ন। আসলে পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রতিনিধি হলেও সুচি মনেপ্রাণে বর্মী জাতীয়তাবাদী। ইতোমধ্যে বর্মী সামরিক শাসকরা নিজেদের শাসন সুদৃঢ় করতে উগ্র বর্মী জাতীয়তাবাদের প্রচার শুরু করে। মূল গোত্রের বর্মীরা ধর্ম বিশ্বাসে বৌদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের অহিংস জীবনাচরণে বিশ্বাসী।

কিন্তু ভাষা-ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বর্মী জাতীয়তাবাদ ক্রমে এতটাই উগ্র হয়ে ওঠে যে, তারা ভিন্ন ভাষী ভিন্ন ধর্মী বর্মীদের মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানা তো দূরের কথা, সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সদস্যদের সঙ্গে চলে নিরন্তর বাদ-বিসংবাদ ও সহিংসতা। এতে স্বার্থসিদ্ধি সর্বাধিক শাসকদের। জনতার দৃষ্টি সরে যায় সামরিক শাসন থেকে জাতিগত সাম্প্রদায়িক অধিকারবিরোধী সংঘাতে।

জাতীয়তার গোঁড়ামির টানে বার্মা বা ব্রহ্মদেশের নাম নির্ধারিত হয় মিয়ানমার, পূর্ব ঐতিহ্যের নিরিখে। রাজধানী রেঙ্গুনের নাম রাখা হয় ইয়াঙ্গুন। চলে অনুরূপ পরিবর্তন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। গোটা এশিয়ায় একই ধারার পরিবর্তন। চীন থেকে ভারত। জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক নিরিখে জনচেতনা উদ্বুদ্ধ করতে এ ধরনের জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক পরিবর্তন। যেমন ভারতের তামিল ভাষা জাতিসত্তার নিরিখে ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি হয়ে ওঠে তামিলনাড়ু। অনুরূপ পরিবর্তন সর্বত্র। পিকিংয়ের নতুন নাম বেইজিং-পেইচিং। সমাজতান্ত্রিক দেশেও জাতীয়তাবাদের প্রবলতা।

মিয়ানমারের এই রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ডামাডোলের প্রভাব থেকে রক্ষা পায়নি চট্টগ্রাম-সংলগ্ন আরাকানি সংস্কৃতির ভূখণ্ড। তার নতুন নাম রাখাইন। রাখাইন গোত্রের বৌদ্ধরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানকার অধিবাসী ভিন্ন জাতিসত্তার রোহিঙ্গা হিন্দু-মুসলমান। এরা কিছুটা রক্ষণশীল হলেও উগ্র জাতীয়তাবাদী নয় বলেই সামরিক সংঘাতে অভ্যস্ত নয়। ভারতীয় উপমহাদেশের এককালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল কারণগুলো এখানেও সক্রিয়। নেপথ্যে কায়েমি স্বার্থ, জমি-ভিটা, অর্থ-সম্পদ; অন্যদিকে রয়েছে শাসকশ্রেণির সমর্থন, হোক তা সামরিক জান্তা বা কথিত গণতন্ত্রী সু চি।

গূঢ় অভিসন্ধি, একদা চট্টল-সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রোহিঙ্গাদের বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে পাঠানো। মাঝখানে প্রকৃতির বিভাজনে নাফ নদীর অবস্থান। এ অবস্থায় রোহিঙ্গা নির্যাতন ও তাদের বাংলাদেশে পাঠানোর সূচনা ঘটায় মিয়ানমারের সামরিক জান্তা তাদের বিতাড়ন নীতির কার্যক্রম সক্রিয় করার মাধ্যমে। সামরিক অপারেশনের নিষ্ঠুরতা ইতিহাসে ধৃত।

তখন বহুসংখ্যক রোহিঙ্গা চট্টগ্রামের সীমান্ত এলাকায় আশ্রয় নেয়। কারো হিসাবে তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক। দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব তাদেরকে একাধিক অপশক্তির হাতে খেলার পুতুল করে তোলে। বাদ যায় না এনজিও এবং

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ কক্সবাজারের উখিয়ায় কুতুপালং ক্যাম্পে বাংলাদেশ সীমান্তে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করেন – পিআইডি

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলো হয়ে ওঠে যত অসামাজিক, অনৈতিক ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। অর্থনীতি এতে প্রবল কারণ হিসেবে বিবেচ্য।

বাংলাদেশ সরকার তখন এদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের জন্য যথেষ্ট মাত্রায় উদ্যোগ নেয়নি। যা করেছে তা আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের। ফলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অস্থায়ী আবাস হয়ে ওঠে চট্টগ্রামের প্রান্তিক এলাকা টেকনাফ-উখিয়া। এখান থেকে এদের কিছুসংখ্যক এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবে তা তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় নয়। এরপর মাঝে মধ্যে চলেছে রাখাইনে সাম্প্রদায়িক সংঘাত এবং যথারীতি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ।

কিছুদিন থেকে রাখাইন পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছে। একদিকে সামরিক জান্তা ও শাসকশ্রেণির রোহিঙ্গা বিরোধিতা, অন্যদিকে উগ্রপন্থি রাখাইন বৌদ্ধদের রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংস হামলা। দুই পক্ষেরই হামলার ধরন নারী ধর্ষণ, নারী-পুরুষ, শিশু হত্যা, তাদের পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা ও সম্পদ দখল, কখনো তার আগে অগ্নিসংযোগ। পরিণামে উপদ্রুত রোহিঙ্গাদের নানা পথে চট্টগ্রাম সীমান্তের উদ্দেশে যাত্রা। যাত্রাপথে নানা অঘটন ও মৃত্যু।

এ পর্বে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বাধা। এতেও দুর্দশা বৃদ্ধি। বিশ্ববিধান এতদিন চুপচাপই ছিল। কারণ বাংলাদেশের মিয়ানমার বিরোধী তদবির যথেষ্ট জোরালো ছিল না। তবু শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের উদ্যোগে সাবেক মহাসচিব কফি আনানকে পাঠানো হয় অবস্থা সরেজমিন দেখেশুনে প্রতিবেদন পেশ করতে। সে প্রতিবেদন সেখানকার শাসকশ্রেণির পক্ষে যায়নি বলে তারা তা গ্রহণ করেনি। বরং ২৪শে আগস্ট প্রতিবেদন পেশের পরদিন থেকে শুরু হয়েছে নতুন করে গণহত্যা ও বিতাড়নের বর্বরতা।

দিশেহারা রোহিঙ্গাদের আবারও শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশের দিকে যাত্রা, অনেকে বঙ্গোপসাগর ও নাফ নদীতে ভাসমান। প্রতিনিয়ত ইউটিউব, ফেসবুকে প্রকাশ পাচ্ছে বর্বর হামলার কথা। বাংলাদেশ সরকারের এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশে আহ্বান : 'রোহিঙ্গাদের ফেরাতে চাপ দিন।' অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। কারণ, উপদ্রুত রোহিঙ্গারা স্রোতের মতো বাংলাদেশ সীমান্তমুখী। গত মাসে কয়েক লাখ রোহিঙ্গার সীমান্তে উপস্থিতি। এর মধ্যে শ'পাঁচেক হিন্দু রোহিঙ্গাও শরণার্থী। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা, টিভি ও ইন্টারনেটে এখন প্রধান প্রকাশ রোহিঙ্গা ইস্যু।

দৈনিক পত্রিকাগুলোয় রোহিঙ্গা বিষয়ক খবর ও প্রতিবেদনে ভর্তি। কারণ এ ইস্যুতে নানামাত্রিক অভিঘাত ও পরিণাম। কয়েকটি শিরোনামই পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করবে। যেমন– 'রাখাইনে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, রোহিঙ্গার কাফেলা সীমান্তমুখী, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ অব্যাহত', 'প্রাণ বাঁচাতে সাত লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে', 'কালো মেঘে ঢাকা সু চির গণতন্ত্র', 'থামছে না রোহিঙ্গাস্রোত', 'ছড়িয়ে পড়ছে রোহিঙ্গারা গ্রামেগঞ্জে', 'পাহাড়ে পাহাড়ে ঠাঁই নিয়েছে রোহিঙ্গারা' ইত্যাদি।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকগণ বাংলাদেশে প্রবেশ করছে

যে-কোনো যুক্তিবাদী মানুষ স্বীকার করবেন যে, ঘনবসতির বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্থায়ী অবস্থান নানাভাবে বাংলাদেশি সমাজের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে। করবে রাষ্ট্রের জন্যও। তাই গোড়াতেই বিষয়টিকে আমলে আনা ও সমাধানের জোরালো চেষ্টা চালানো দরকার। বলা বাহুল্য, সে চেষ্টার চরিত্র আন্তর্জাতিক। মানবিক দৃষ্টিকোণ বিচারে তাদের সাময়িক আশ্রয় দিয়ে, ক্যাম্পগুলো নিয়ন্ত্রণে রেখে তবেই মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে আলোচনা।

এ দেশে গণমাধ্যম ক্ষোভে ফেটে পড়ছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও সু চির অপশাসন, অমানবিক শাসনের বিরুদ্ধে। একই অবস্থা টিভি, ফেসবুক ও ইন্টারনেটে। পত্রপত্রিকা সর্বাধিক সোচ্চার খবর, প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় কলামে। ইতোমধ্যে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে বৈশ্বিক মহলের কেউ কেউ। যেমন– তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশ। এর মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার ও সক্রিয় ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং তুরস্ক।

নানা ধরনের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট একটি খবর : 'মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করল মালদ্বীপ।' এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্ট উইদোদোর ঘোষণা– 'মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অ্যাকশন দরকার'। সেই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা– ঢাকায় ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী : 'বাংলাদেশের বোঝা লাঘবে সহায়তা করবে জাকার্তা'। কিন্তু এরা কতদূর যেতে পারবেন পরাশক্তিগুলো সক্রিয় না হলে। সমস্যার সমাধানে আন্তরিক না হলে? তাই বাংলাদেশের কূটনীতিকে জোরালোভাবে সক্রিয় হতে হবে পরাশক্তিদের ঘিরে। চীনকেও বাদ দিয়ে নয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরিস্থিতি ভয়াবহ এবং সেই মাত্রায় জটিল। মূলত বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকার কারণে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা নীরব। সৌদি আরবেরও একই অবস্থা। অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক স্বার্থে চীন মিয়ানমারের পক্ষে। ভারত কতটা উদ্যোগী হবে সমস্যা নিরসনে, তা খুব স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তি বিচারে নিঃসঙ্গ। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পূর্বোক্ত মুসলিম দেশগুলোর হঠাৎ তৎপরতা একমাত্র আশার আলো। সেই সঙ্গে জাতিসংঘের তৎপরতা পক্ষে টানতে হবে, শুধু ত্রাণে নয়, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে। আশার কথা হলো, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করেছেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে এবারই প্রথম নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে।

সরকার বর্তমান পরিস্থিতিকে কৌশলে, দূরদর্শী আচরণে ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় কাজে লাগাতে সচেষ্ট। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় শিবিরগুলোতে জাতিসংঘের ত্রাণ সহায়তা ব্যাপকভাবে টেনে আনার চেষ্টা চলছে। রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতায় সমাধান করার জন্য কাজ করছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রী। যেমনটা দেখা গিয়েছিল একাত্তরে, ভারতের তৎপরতায়। আন্তর্জাতিক তৎপরতায় চীন ও রাশিয়াকে কাছে টানার চেষ্টাও চালানো প্রয়োজন। বর্তমান চীন ও রাশিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও জাতিসংঘে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী পরাশক্তি রাষ্ট্র। তাদের সমর্থন সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এদিকে বিশেষ তৎপর হতে হবে।

মনে রাখতে হবে, রোহিঙ্গা ইস্যুর সমাধান এবং তাদের প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে বাংলাদেশকে। কাজেই বর্তমান বিদেশি তৎপরতা আমাদের জন্য সময়ের এক ফোঁড়। একে হারালে চলবে না।

লেখক : ভাষা সংগ্রামী, রবীন্দ্র গবেষক, কবি ও প্রাবন্ধিক।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শেখ রাসেলের জন্মদিন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার শিশুদের কাছে অতি প্রিয় একটি দিন। এই দিনটি আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অনেক দেশে জাতিসংঘের আহ্বানে 'বিশ্ব শিশু দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়।

আবার বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে আলাদাভাবে জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশে জাতীয় শিশু দিবস পালন করা হয় প্রতিবছর ১৭ই মার্চ। এ দিন জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর জন্মদিন। এ দিনে শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে।

শিশুরা আমাদের সম্পদ এবং মানব জাতির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে শিশুদের অধিক হারে জীবন বিপন্ন হওয়ায় বিবেকবান মানুষেরা অবাক হন এবং তারা নিষ্পাপ শিশু হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তেমন কোনো কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তবে জেনেভা শিশু অধিকার ১৯২৪ ঘোষণা করা হয়। বিশ্ব শিশু দিবসের ইতিহাসে এই ঘোষণা ভবিষ্যতের ভিত তৈরি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানে লক্ষ লক্ষ শিশু ও নারী নিহত হলে গোটা বিশ্ব প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ায় তারা শিশুর জন্য নিরাপদ বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে প্রায় সকল দেশে বৈঠক ও সম্মেলনে মিলিত হয়। এক পর্যায়ে তারা জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়। অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ৪৪ বছর পরে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর প্রস্তাবিত শিশু অধিকার সনদ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়।

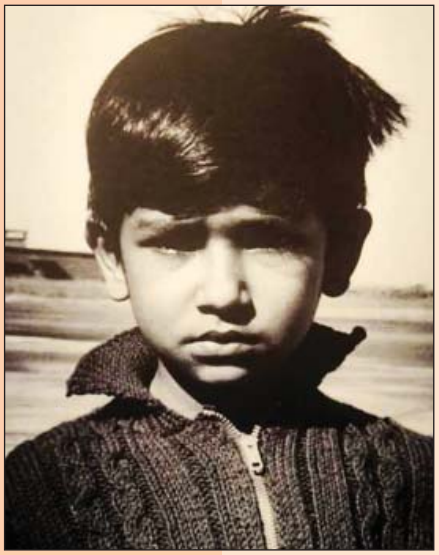

শেখ রাসেল

জাতিসংঘ প্রণীত শিশু অধিকারের মূল বক্তব্য হলো– মৌলিক মানবাধিকার এবং মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তথা জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য হচ্ছে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা। সাথে সাথে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সুপরিবেশ গড়ে তোলা এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্কতার কারণে জন্মের আগে বা পরে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। শিশু অধিকার সনদে রয়েছে ৫৪টি অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদসমূহের ধারা সংরক্ষণ এবং মানতে বাধ্য জাতিসংঘের অনুসরণকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ। সনদের ধারায় পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, শিশু অধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্রসমূহ শিশুর নিরাপত্তা, খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা, বিকাশ ও বিনোদনসহ সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। শিশু অধিকার সনদ বিশ্ব শিশু দিবসের দলিল। এই দলিলকে সামনে রেখেই দিবসটি পালন করা হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, শিশু অধিকার সনদ জাতিসংঘে প্রণীত হবার অনেক পূর্বে বাংলাদেশে শিশু আইন ১৯৭৪ প্রবর্তিত হয়, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর একান্ত আগ্রহে প্রণয়ন করা হয়। শুধু তাই নয়, এই শিশু আইন প্রণয়নের কথা আগেই আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে শিশু আইন ১৯৭৪-এর আলোকে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রবর্তন করা হয়েছে।

আমরা অনেকেই জানি, জাতিসংঘের 'ইউনিসেফ' নামে একটি সংস্থা রয়েছে। যার অফিস রয়েছে সনদে স্বাক্ষরকারী প্রতিটি দেশে। এই সংস্থাটি বিশ্বের শিশু পরিস্থিতির প্রতিবেদন প্রতিবছর প্রকাশ করে। ফলে আমরা গোটা বিশ্বের শিশুদের হালহকিকত জানতে পারি। শিশুর উন্নয়নেও এই সংস্থাটি কাজ করে। কিন্তু আমরা কী দেখতে পারছি– গোটা বিশ্বের শিশুরা আজ নির্যাতিত ও অসহায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের তৈরি দুর্যোগে শিশু ও বয়োবৃদ্ধরাই প্রাণ হারান। এখনো হানাহানির শিকার শিশুরা। উটের জকি থেকে শুরু করে শিশু পাচার, শিশু অপহরণ, শিশুর মৃত্যু ঘটিয়ে কিডনি সংগ্রহ এবং শিশুকে নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়ে শরণার্থী করা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা শিশুদের হত্যা ও স্বদেশভূমি ত্যাগে বাধ্য করার কথা বিশ্ববাসী জানে। পৃথিবীর কোথাও শিশুর অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয় না। আমাদের দেশে এর ব্যত্যয় ঘটে না। শিশুশ্রম নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও শিশুদের কারখানায় নিয়োগ এবং অকারণে শিশুদের পেটে বাতাস ঢুকিয়ে প্রাণ সংহারও আমাদের চোখে পড়ে। এভাবে শিশুর বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশে কত শিশু নানাভাবে নৃশংসতার শিকার হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। কিন্তু কেন এই হিংস্রতা ? যারা শিশু হত্যা করে, তারাও একসময় শিশু ছিল, কিংবা তাদের ঘরে হয়ত শিশু রয়েছে। শিশুরা কখনোই অপরাধ করে না। তারা অবোধ, কোমল ও নিষ্পাপ। তাহলে পৃথিবীতে কেন শিশুবলি? কেন শিশুরা অকারণে রাজনৈতিক শিকার ?

আমরা অনেকেই জানি, শেখ রাসেল এখন অধিকারহারা শিশুদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। কারণ তারও বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করা হয়। তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। অবাক কাণ্ড এই শিশুটির জন্ম কিন্তু বিশ্ব শিশু দিবস পালনের অক্টোবর মাসেই। অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখ শেখ রাসেল ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা রেনু।

জন্মদিনে যদিও শোক ও বেদনার কথা বেমানান। তবুও তার অধিকার হরণের কথাটি বলা আবশ্যক। সেই পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টের ধলপ্রহর। বঙ্গবন্ধুর খুনিরা তাকে আর তার চাচাকে উপর থেকে নিচে নামিয়ে এনেছিল। রেখেছিল পুলিশ পাহারাদারদের কক্ষে। সেখানে রাসেল 'মায়ের কাছে যাব' এবং 'আমাকে মারবে নাতো?' এমন বাঁচার আকুতি-মিনতি করছিল। একটু পরেই একজন খুনি রাসেলকে মায়ের কাছে নেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মায়ের লাশের কাছে দাঁড় করিয়ে প্রাণসংহার করে। একজন নিষ্পাপ শিশুর বাঁচার সেই অধিকার লঙ্ঘন করেছিল মানবতার শত্রু নরপিশাচরা। তখন রাসেলের কত বয়স হবে, প্রায় ১১ বছর। রাসেল রাজনীতির 'র'ও বুঝত না। যদিও তাদের বাড়িটির পরিবেশ ছিল রাজনীতির আবহে। তার স্বপ্নের জগৎ ছিল মা-বাবা, ভাই-ভাবি ও আপা এবং বাড়ির সহকর্মীদের নিয়ে। স্কুলের এবং পাশের বাড়ির দু-একজন বন্ধুও ছিল। সোজা কথা, তার গণ্ডি ছিল সীমিত। একবার শুধু জাপান গিয়েছিল। তাই তার জন্মদিনে প্রশ্ন জাগে– হিংস্র ও বর্বর পশুরা কেন হত্যা করল। কেন হত্যা করল ঐ ধলপ্রহরে অন্য বাড়িতে বেবী, আরিফ, সুকান্ত ও রিন্টুদের? আর খুনিদের ছোড়া কামানের গোলায় কেন নিহত হতে হলো মোহাম্মদপুরের ১৩/১৪ জন নিরাপরাধ মানুষকে। যাদের মধ্যে শিশুরাও ছিল।

বিশ্ব শিশু দিবস পালনের মাসে শেখ রাসেলের জন্ম, যে মাসে শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। শিশুদের আনন্দ ভুবনের স্বপ্ন দেখানো হয়। রাসেলের সেই ভুবন দেখা হয়নি। রাসেল নেই, আছে তার শিশু বন্ধুরা। তাদের চোখেই রাসেল প্রতীকী হয়ে বেঁচে আছে। রাসেল এখন শুধু একটি নামই নয়, রাসেল অধিকারহারা শিশু সমাজের প্রতিনিধি। রাসেলের জন্মদিন আনন্দ-বেদনায় মিশ্রিত। বেদনা সংবরণ করে শপথ নিতে হবে: শিশুর নিরাপদ জগৎ চাই, আর নয় শিশু হত্যা, শিশুর অধিকার হরণ করা চলবে না। দেশের শিশু-কিশোরদের অধিকার বাস্তবায়নে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

STOP MUSLIM GENOCIDE IN MAYANMAR

বিশেষ নিবন্ধ

রোহিঙ্গা সমস্যা

আনান কমিশনের রিপোর্ট

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের জন্য বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছে। ৮ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা ইতোমধ্যে উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়করণের পথেও আস্থার সংকট সৃষ্টি করছে এ সমস্যা। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে জঙ্গিবাদ বিস্তারের যে বিপদ সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলাদেশের জন্যও হুমকিস্বরূপ।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাখাইনে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের 'বাঙালি' আখ্যা দিয়ে তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করে আসছে মিয়ানমার। এজন্য তাদের নাগরিক অধিকার বঞ্চিত করা হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। এ নিয়ে বার বার সহিংসতা ছড়ালেও বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি। ব্যাপক সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে মিয়ানমারের ৬ জন এবং নেদারল্যান্ডস ও লেবাননের ২ জন নাগরিককে নিয়ে ৯ সদস্যের একটি কমিশন গঠিত হয়। 'অ্যাডভাইজরি কমিশন অন রাখাইন স্টেট' শীর্ষক ওই কমিশন গত এক বছরে মিয়ানমারের সিটওয়ে, মংডু, বুথিডং, ইয়াঙ্গুন, নেপিডো ছাড়াও ব্যাংকক, ঢাকা, কক্সবাজার ও জেনেভায় অন্তত ১৫৫টি বৈঠক করে প্রায় ১ হাজার ১০০ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে তাদের প্রতিবেদন তৈরি করে। আনান কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ৮৮টি সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি ২০১৭ সালের ২৪শে আগস্ট আনান কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। একই দিন বিকালে ইয়াঙ্গুনে এ বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন কফি আনান। এর আগে তিনি প্রতিবেদনটি মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট তিন কিউ ও শীর্ষ নেত্রী অং সান সু চির কাছে তুলে দেন। আনান কমিশনের প্রতিবেদন মিয়ানমারের স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক শান্তির জন্যও প্রাসঙ্গিক দাবিদার।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নারী ও শিশু

বিশ্ব সম্প্রদায়ের চাপের মুখে পড়ে রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে কফি আনান কমিশনের দেওয়া ৮৮ দফা সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে মিয়ানমার সরকার। এই কমিটি গঠনের ব্যাপারে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে বলা হয়েছে, রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক বিষয়াদির উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে রাখাইন নিয়ে জরুরি বৈঠকের আগে আকস্মিক এই কমিটি গঠনের কথা জানায় প্রেসিডেন্ট দফতর। আনান কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নে ১৫ সদস্যের এ কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন সমাজকল্যাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী উইন মিয়াত আয়, আর কো-চেয়ার হিসেবে থাকছেন রাখাইন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিপু। এই কমিটি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কাজ করবে।

আনান কমিশন প্রতিবেদনে রাখাইনের জনগণকে 'রোহিঙ্গা' বলা হয়নি, মিয়ানমার সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, 'বাঙালি'ও বলা হয়নি। বলা হয়েছে 'রাখাইনের মুসলমান সম্প্রদায়'। আনান কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শুরু থেকেই আহ্বান জানিয়ে আসছে। আনান কমিশনের সুপারিশগুলো দ্রুত ও পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন এবং এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত হতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

রাখাইনের জনগণের শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে রাখাইনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, নাগরিকত্ব, চলাফেরার স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি, মানবিক সহায়তায় প্রবেশাধিকার, গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাদক, সাম্প্রদায়িক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব, আন্তঃসাম্প্রদায়িক পছন্দের অধিকার, আন্তঃসাম্প্রদায়িক সংহতি, নিরাপত্তা খাত, ন্যায়বিচার, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ইস্যু এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও আঞ্চলিক সম্পর্ক পয়েন্টে সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের সুপারিশমালায় বলা হয়েছে :

১) রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান এবং মিয়ানমার ও বাংলাদেশ মিলে যৌথ যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের নিরাপদে (বাংলাদেশ থেকে) প্রত্যাবাসন করতে হবে।

২) ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। এরই মধ্যে নাগরিক হিসেবে যাচাই হওয়া ব্যক্তিদের সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হবে।

৩) মিয়ানমারের নাগরিকত্ব আইনটি আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, নাগরিকত্ব ও জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৪) যারা মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি তাদের সে দেশটিতে অবস্থানের বিষয়টি হালনাগাদ করে ওই সমাজের অংশ করে নিতে হবে।

৫) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার অবাধ চলাচলের সুযোগ দিতে হবে।

৬) রাখাইনে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলোও উপকৃত হতে পারে।

৭) মিয়ানমারের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮) অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুহারাদের শিবিরগুলো বন্ধ করে সমাজেই তাদের সম্পৃক্ত করার নীতি নিতে হবে।

৯) সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সুসম্পর্ক সৃষ্টি এবং সমাজের সব সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১০) সীমান্ত ইস্যুসহ অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ-মিয়ানমার সুসম্পর্ক জোরদার করতে হবে।

১১) সুপারিশ বাস্তবায়নে মিয়ানমারে কাঠামো সৃষ্টি এবং মন্ত্রী পর্যায়ের কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে।

আনান কমিশনের *FINAL REPORT OF ADVISORY COMMISSION ON RAKHINE STATE* শীর্ষক প্রতিবেদনের ৮৮টি সুপারিশ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine

MAIN FINDINGS AND RECOMMENDATIONS ARE

1. The Commission acknowledges that the question of resource sharing between the Union and State Governments will be dealt with in the context of the national peace process and constitutional reform.

Nevertheless, the Commission urges the Government to increase the participation of Rakhine's local communities in decision making affecting the development of the state, and find ways to ensure that local communities benefit from investments – including natural resource extraction – in Rakhine State.

2. The Government should ensure adequate compensation for appropriated land.

3. The Commission reiterates that the Government of Myanmar should carry out a comprehensive assessment (or a so-called strategic environment assessment) for Kyawkpyuh and its environs to explore how the Special Economic Zone (SEZ) may affect local communities and map how other economic sectors in the state may benefit (or possibly suffer) from the SEZ. Moreover, the Government should require foreign companies involved in the development of the SEZ to develop robust mechanisms for information sharing and consultation with local communities and civil society, in accordance with principles of corporate social responsibility.

4. The Government should carry out labour market assessments – as well as a mapping of anticipated labour needs generated by planned industrial development in Rakhine, including the SEZ – in order to design targeted vocational training. If vocational training is not market-linked, it will simply present incentives for migration.

5. The Government should be particularly sensitive to the needs of women whose labour force participation remains low. In labour market assessments, their potential and needs should be given special attention. In vocational training, women should be prioritized.

6. The Government should continue to invest heavily in infrastructure, including roads, waterways, jetties, electricity, drinking water and internet provision. In order to boost tourism, the Government should ensure that the planned airport in Mrauk U is constructed.

7. In order to increase productivity, the Government should expand extension services to farmers, including mechanization, provision of quality seeds, and training in modern agricultural techniques.

8. The Government should address regulatory issues that currently constrain SMEs and family businesses. These include:

a) Reforms related to lending, such as ending 1-year maximum loan terms, introducing flexibility to interest rate fixation and providing incentives for micro-finance providers to engage with businesses in Rakhine.

b) Expansion of access to agricultural credit for all communities.

c) Removal of the Ministry of Hotels and Tourism prohibition on guesthouses and B&Bs of less than ten rooms, that presents barriers to entry for family-owned enterprises.

9. The Government should seek to reduce red tape in order to promote business and expand accepted documentation to receive business licenses, not least as a way to include more Muslim businesses within the formal economic sector and reduce barriers to entry.

10. To ensure that mitigation and adaptation measures are in place to counter the adverse effects of climate change, the Government should urgently step up its efforts to strengthen the capabilities of communities to adopt climate resilient options. Critical measures include the development and distribution of resilient seed varieties, crop diversification, increased water storage options, drip irrigation and strengthening the availability of climate-sensitive advisory services for farmers. The Government should also seek to improve the state's irrigation systems through the construction of embankments. To this end, the Government could subsidize contracted cash-for work labour.

CITIZENSHIP

In order to accelerate the verification process in line with the 1982 Citizenship Law, the following steps should be taken:

11. The Government should immediately ensure that those who are verified as citizens enjoy all benefits, rights and freedoms associated with citizenship. This will not only serve to strengthen the Government's rule-of-law agenda, but also demonstrate immediate tangible benefits of the verification exercise.

12. The Government should establish a clear strategy and timeline for the citizenship verification process. This strategy should be transparent, efficient and with a solid basis in existing legislation. The strategy should be discussed with members of the Rakhine and Muslim communities and communicated through a broad outreach campaign. The strategy should include a clear timeline for the different stages of the process. The process should also be made simpler and enable individuals to apply for citizenship at the same time as they apply for NVC. To increase the accessibility of the process, the use of an uncle or aunt's documents (or other family members) should be permitted when the parent's documents are missing. The Government should ensure that the verification process is adequately resourced.

13. The Government should clarify the status of those whose citizenship application is not accepted.

14. Like all countries, Myanmar will need a status for those who reside in Myanmar without being citizens. The rights of non-citizens who live and work in Myanmar need to be regulated. The Government should clarify residency rights and provide associated documentation, which is a common practice around the world.

15. While urging Rakhine and Muslim communities to work constructively with the Government to revitalize the citizenship verification process, the Commission also urges the Government to ensure that the process is voluntary. The Government should create proper incentives to encourage people to participate.

16. Complaints related to the on-going verification processes should be addressed swiftly by a Government authority independent of the institutions responsible for the implementation of the verification processes.

1982 CITIZENSHIP LAW

17. While recognizing that the 1982 law is the current basis for citizenship, the Commission recommends the Government set in motion a process to review the law. As part of such a review, the Government might wish to consider the following:

a) Aligning the law with international standards and treaties to which Myanmar is a State Party, including Articles 7 and 8 of the Convention on the Rights of the Child;

b) Bringing the legislation into line with best practices, including the abolition of distinctions between different types of citizens;

c) That as a general rule, individuals will not lose their citizenship or have it revoked where this will leave them stateless;

d) Enabling individuals who have lost their citizenship or had their citizenship revoked to reacquire it, if failing to do so would leave them stateless;

e) Finding a provision for individuals who reside permanently in Myanmar for the possibility of acquiring citizenship by naturalisation, particularly if they are stateless;

f) Re-examining the current linkage between citizenship and ethnicity;

g) Within a reasonable timeline, the Government should present a plan for the start of the process to review the citizenship law. The Government should also propose interim measures to ensure that – until new or amended legislation is in place– existing legislation is interpreted and applied in a manner that is non-discriminatory, in line with international obligations and standards and based on an assessment of how today's needs have changed compared to the conditions prevailing in 1982. The law should be reviewed to ensure the equitable treatment of all citizens.

FREEDOM OF MOVEMENT

18. In general, the Government should ensure freedom of movement for all people in Rakhine State, irrespective of religion, ethnicity or citizenship status. The freedom of movement and access to services are deeply interlinked and therefore should be addressed in parallel. All communities should have access to education, health, livelihood opportunities and basic services.

19. The Commission reiterates that the Government should conduct a mapping exercise to identify all existing restrictions on movement in Rakhine, as recommended in the interim report. The mapping should include all formal, informal and social restrictions affecting all communities and be conducted at the village and township level. Following the mapping, the Government should establish a road map for the lifting of restrictions – with clear timelines and milestones. The various steps of this process should be accompanied by well-developed and conflict-sensitive communications strategies to prepare all communities prior to initiation.

20. The Government should introduce measures to prohibit informal restrictions that include, among others, unofficial payments, arbitrary roadblocks, and requirements for the Muslim community to pay for security escorts. Perpetrators should be prosecuted in accordance with the law.

21. Pending the eventual lifting of all above-mentioned movement restrictions, the Government should immediately simplify the travel authorization system to allow movement across townships and outside the state.

22. The police should uphold the rule-of-law and ensure that anyone who obstructs movement – for instance by using violence or threats of violence as a means of preventing movement – is held accountable in accordance with the law.

23. To ensure equality before the law, the Government should undertake a mapping and legal review of all local regulations and orders in Rakhine State which restrict the rights and freedoms of minorities.

ITERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS)

24. The Commission reiterates that the Government of Myanmar should prepare a comprehensive strategy towards closing all IDP camps in Rakhine State. The strategy should be developed through a consultation process with affected communities, and contain clear timelines. It should also contain plans for the provision of security and livelihood opportunities at the site of return/ relocation.

25. The Government should cooperate with international partners to ensure that return/relocation is carried out in accordance with international standards, including:

a) All returns or relocations must be voluntary, safe and take place in a dignified manner.

b) The aim should be to facilitate returns to places of origin as a matter of priority, or otherwise respect the choices of the displaced.

c) Ensure that IDPs participate actively in the planning and management of their return, relocation, or local integration.

d) Relocation/local integration should not confine IDPs to substandard areas without adequate access to basic services or livelihood – or to areas where the safety and security of the IDPs cannot be ensured.

e) The choice to relocate must not be regarded as a renunciation of the right to return in safety and with dignity to the original place of residence, should that choice become feasible later.

f) IDPs and host communities must be consulted in a thorough and meaningful manner.

26. In the interim – and without affecting the closure of the IDP camps – the Government should ensure dignified living conditions in camps, including:

a) Improved shelter: Address current overcrowding by building additional/larger longhouses or individual houses in line with international humanitarian standards. When additional land is needed, host communities should be adequately compensated for the use of their land.

b) Improved water and sanitation: Update infrastructure for water, sanitation and hygiene (WASH), particularly for solid waste management.

c) Improved education: Recognise Temporary Learning Spaces (TLS) as formal schools, work with international partners to increase the number of TLS, and support and invest in teacher training, salaries, and teaching learning material.

d) Improved livelihoods: Improve job opportunities for both men and women – thus reducing reliance on international aid – through vocational training and income-generating activities in the camps, and facilitate work outside the camps.

HUMANITARIAN ACCESS

27. The Government of Myanmar should ensure full and unimpeded humanitarian access – for both national and

international staff – at all times and to all communities in Rakhine State.

28. The Government, assisted by international partners, should ensure that humanitarian assistance is provided in accordance with international protection principles, including do-no-harm, impartiality, non-discrimination, protection from physical and psychological harm, and recognition of rights and access to remedies.

29. Reconsider the requirement for government officials to accompany international staff to the field, and simplify and standardize the travel authorization process for aid organizations (for instance by issuing three-month multiple entry permits to humanitarian project sites).

30. International humanitarian actors should seek to work closely with the Government, and consult and inform the Government about on-going and planned activities in a timely manner.

MEDIA ACCESS

31. The Commission reiterates that the Government of Myanmar should provide full and regular access for domestic and international media to all areas affected by recent violence – as well as all other areas of the state.

32. At the same time, the Government should increase and improve its public communication related to developments in Rakhine State.

EDUCATION

33. The Union Government and the Rakhine State Government should ensure – and publicly state – that all communities in Rakhine have equal access to education, irrespective of religion, ethnicity, race, gender, or citizenship status. The Government should remove movement restrictions that reduce access to education, and reverse discriminatory practices that inhibit students without citizenship from higher education.

34. To give the education sector in Rakhine a major lift, the Government should develop a comprehensive plan for the strengthening of the state's education sector, focusing on equal access, improved quality of education, and upgrading of physical facilities and teaching material. International partners should be ready to support Myanmar in these efforts both technically and financially.

35. The Government should immediately expand primary education to the communities in northern Rakhine State, and intensify efforts to ensure that teachers assigned to Muslim villages resume their work, including by providing adequate security when necessary. The Government should ensure that all children in the state have access to education in Myanmar language.

36. The Government should assess and address the indirect costs of schooling, such as costs related to transportation, food, uniforms, teaching materials and other equipment, which reduce access to education for the poorest segments of all communities.

37. The Government should expand access to post-primary education for children from all communities (including IDPs), and – for instance – explore the possibility of increased IT-based solutions, as well as government-matched pupil bursary schemes.

HEALTH

38. The Commission reiterates that the Union Government and the Rakhine State Government should ensure – and publicly state – that all communities have equal access to health treatment, irrespective of religion, ethnicity, race, gender, or citizenship status. The authorities should commence the removal of administrative obstacles that impede access to health care. Health facilities should be labelled as `protected zones', providing a safe environment for those seeking care.

39. The Government should ensure that each village in Rakhine – as a minimum – has access to a full-time community health volunteer who is recognized by the state's health system, and have referral capacity to the nearest health centre or station hospital. These volunteers should be trained in childhood diseases, maternal and child healthcare and undernutrition, and be able to support the birth registration process. The Government should also recruit one auxiliary midwife per village, and train and hire health staff from each community to be represented in the township level health work force (and provide support for transportation costs and per diems) to expand rural health coverage.

40. The Government should ensure the availability of a standardized list of equipment for each level of medical care, including township hospitals, sub-station hospitals, rural health centres and sub-health centres. The pharmaceutical supply chain management should be standardized according to facility level, and the blood bank system should be expanded.

41. The Government should increase health capacity by recruiting volunteers – from outside state or country – to ensure appropriate ratio between population and health personnel.

42. The Commission commends the Government for moving forward with the plans to expand and refurbish the Sittwe General Hospital, in line with the Commission's interim recommendations. The Commission urges the Government to redouble its efforts to overcome remaining administrative hurdles, and urgently move to the implementation phase of the project. It also urges international donors to provide technical and financial support in accordance with needs.

43. The Government should roll out a comprehensive state-wide program to combat malnutrition.

44. The Government of Myanmar should accelerate efforts to implement a comprehensive immunization outreach campaign to cover all populations, regardless of citizenship status, with specific attention to those areas which were under prolonged lock-down. International partners should assist such efforts by providing technical and financial support in accordance with needs.

45. The Government should establish a complaint mechanism to report incidences of corruption, informal payments, exploitation or discriminatory practices in the health sector, and hold perpetrators to account.

46. The Commission reiterates that the Government should expand primary health care services through increased number of mobile health clinics.

DRUGS

47. The Government of Myanmar should adopt a holistic anti-drugs approach based on public health, community safety, human rights and development. As illegal activities tend to thrive in areas of conflict, the Government should strive towards the social, economic and political inclusion of the Muslim community in northern Rakhine State. As such, the Government should seek to increase access to public services, and increase livelihood opportunities by removing restrictions on movement.

48. The Government should strengthen health and harm reduction services for drug users, and ensure that the use of such services is voluntary.

49. The Government should intensify its efforts to combat corruption within the security agencies operating along the Myanmar-Bangladeshi border.

50. In its law enforcement efforts, the Government should not only focus on users or low-level dealers, but rather concentrate

its efforts on identifying and prosecuting major producers and drug barons.

COMMUNAL PARTICIPATION AND REPRESENTATION

51. In general, the Government of Myanmar should take steps to promote communal representation and participation for underrepresented groups, including ethnic minority groups, stateless and displaced communities, and women; increase government engagement with the public and build trust between the Government and communities at the local level; and improve civil society participation in policy design and implementation.

52. The Rakhine State Government and General Administration Department should increase access to civil service positions for individuals from ethnic and religious minorities in the state, with particular effort to incorporate women from those groups. The Commission also reiterates that the composition of the police force should reflect the population in all components, including women and minorities.

53. The Government should facilitate the registration process for civil society organizations from all ethnic and religious groups. The process should be simplified, entailing a reduced amount of required documentation and lowered application fees.

54. The Government should mandate regular (for instance quarterly) township-level civil society dialogue meetings, to be independently organized by civil society actors, and attended by representatives from local administration, relevant line ministries, and members of the State Parliament. These meetings should seek to gather detailed feedback from communities and civil society on the design of policies currently being considered at state level.

55. The Rakhine State Government should establish a mechanism which would serve as the focal point for information dissemination and feedback on government performance, and gather community and civil society feedback on policies under consideration. Such feedback should be conveyed to the Union Government along with recommendations for adaptations based on community input.

56. The Rakhine State Government and General Administration Department in Rakhine State should ensure that all 10- and 100-household leaders, Village Administrators and Village Tract Administrators are directly elected by the residents of each village/village tract.

57. As for IDPs, in February 2017, international agencies in Rakhine submitted to the Rakhine State Government a revised Terms of Reference and Code of Conduct for the CMCs. The provisions seek to increase the representativeness of the CMCs and to curtail corruption. The Commission urges the Government to implement the plan.

58. In line with Myanmar law, the Government should consider establishing the post of Ethnic Affairs Minister for all ethnic minorities in Rakhine with more than 0.1 percent of the population.

59. A Women's Affairs Department should be established within the Rakhine State Government, responsible for coordinating women's empowerment initiatives, and providing technical support to line ministries and GAD offices on adapting implementation approaches to suit the needs of women and girls.

INTER-COMMUNAL COHESION

60. The Government of Myanmar should ensure that inter-communal dialogue is held at all levels of society – including township, state and union levels – and conducted in a systematic manner with a clearly stated purpose. The dialogue process should ensure grassroots participation, and include women, youth, minorities and civil society. Dialogue within communities should also be facilitated.

61. The Government of Myanmar should empower local Township Administrators in Rakhine to play a key role in facilitating dialogue by including this within the scope of their terms of reference, and by providing training on dialogue and mediation techniques. Rakhine and Muslim community leaders should also be provided with training in mediation and be exposed to lessons and best practices.

62. To support the reconciliation process, the Government should initiate activities that help create an environment conducive for dialogue. These may include:

a) Providing opportunities for Muslims and Rakhine to engage informally through joint activities, such as vocational training, infrastructure projects, or cultural events.

b) Fostering tolerance through cultural mediums, civic education, and awareness-raising activities to dispel misinformation about religion.

c) Establishing joint youth centres in areas accessible to both communities, which should promote joint activities such as sports, music, and arts.

63. The Government should actively combat all forms of hate speech, in particular when directed at ethnic or religious minorities. The Government is the guarantor of civic peace and should ensure that Myanmar has a robust legal framework to this end, and forcefully prosecute those who incite ethnic or religious hatred.

64. Religious leaders – Buddhist, Muslim, Christian and others – should actively support the Government's agenda to combat hate speech and racial/religious discrimination. When acts of violence are committed by members of one ethnic/religious group, their religious leaders should promptly and publicly denounce such actions.

THE SECURITY SECTOR

65. The Commission welcomes the efforts already underway to extend training on human rights awareness to Myanmar security personnel as recommended in the Commission's interim recommendations. Such efforts should be intensified and become a permanent feature of the training of security personnel. Other kinds of training, including on protection of civilians and community policing should also be provided. International donors should support the Government by providing technical and financial assistance for this purpose.

66. The Government of Myanmar should take steps to improve the monitoring of the performance of security forces. One essential step is to ensure that all security personnel wear a visible name badge and identification number, which has become standard practice in modern policing around the world. Another step would be to install CCTV at all checkpoints in Rakhine to ensure that all security personnel respect the dignity of the members of the public, and do not abuse their power through extortion and/or violence. It will be essential to require all footage to be kept available for inspection.

67. To maintain the high standards expected of the security forces, the Government should establish a permanent mechanism for performance inspection. To harness the power of transparency, such a body should be constituted by a diverse group of experts (including from outside the security forces), and report to the public.

68. The Government should establish a national complaint mechanism, through which individuals may seek redress in cases of abuse or neglect by security personnel. The body should be independent of the Government and report its findings publicly.

69. The Government should simplify the security infrastructure in Rakhine by creating a unified agency for all policing in the state, with a single chain of command reporting directly to the chief of Myanmar's Police Force. This could for instance be done by folding the BGP into the police. All police action, including arrest and detention, should be subject to clear operational procedures and robust scrutiny within a clear legal framework.

70. Security personnel assigned to Muslim majority areas in northern Rakhine State should be offered language training in order to reduce misunderstandings and improve relations with local communities. In the meantime, community liaison officers should be appointed to act as interpreters.

71. In the wake of the fatal attack on the Border Guard Police on 9 October 2016 and the subsequent military operations carried out in northern Rakhine State, allegations have been made of serious human rights violations by the security forces during these operations. In light of such allegations, the Commission reiterates the recommendation in its interim report that the Government should ensure – based on independent and impartial investigation – that perpetrators of serious human rights violations are held accountable. The Commission noted the establishment of the Investigation Commission on the events in Maungdaw, and calls on the Government to release the full report as soon as possible.

ACCESS TO JUSTICE

72. The Government of Myanmar should provide adequate training to members of Rakhine's judiciary, including on: Rule-of-law principles; fair trial and due process; accountability and transparency; mediation principles; gender sensitivity and gender equality; and international standards related to the judiciary.

73. The Government should facilitate the establishment of a rule-of-law centre in Sittwe, and provide its staff with full and unimpeded access to all parts of the state. This centre should provide training to members of the judiciary (see above), and carry out legal awareness campaigns to increase public understanding of the law.

74. The Government should make the following public:

a) Information on how administrative decisions are made, and which government agency is responsible.

b) Overview of existing internal oversight mechanisms, and how the public may formally file complaints about abuse of authority.

c) Information on all relevant fees and processing time for government services.

75. Local authorities, members of the judiciary, and other bodies having a judicial role that are accused of bias or corruption, should incur disciplinary measures if found culpable.

CULTURAL DEVELOPMENT

76. The Government of Myanmar should continue its collaboration with UNESCO and other international partners to ensure Mrauk U's eligibility as a world heritage site.

77. The Government should list and protect historic, religious and cultural sites of all communities in Rakhine. This includes sites such as U Ye Kyaw Thu Monastery, St. Mark Anglican Church, Sri Moha Dev Bari Hindu Temple, the Badar Makkar Sufi Shrine and other cultural landmarks.

BORDER ISSUE AND THE BILATERAL RELATIONSHIP WITH BANGLADESH

78. The Commission welcomes the expressed intention of the Myanmar Government to establish a Joint Commission with Bangladesh, as recommended in the Commission's interim report, to discuss bilateral relations, challenges, and opportunities of mutual interest. The Joint Commission – which should meet at least every quarter – should address issues such trade promotion, infrastructure, people-to-people contact, the management of illegal migration, documentation of refugees and IDPs, voluntary return of refugees, combatting human trafficking and drug smuggling, and security cooperation to combat violent extremism.

79. The Governments of Myanmar and Bangladesh should facilitate the voluntary return of refugees from Bangladesh to Myanmar through joint verification, in accordance with international standards and with assistance from international partners.

80. When refugees from northern Rakhine State return from Bangladesh, the Government of Myanmar should help create a secure environment and, where necessary, assist with shelter construction for those whose homes have been destroyed.

81. Cooperation on security and border management requires urgent attention, particularly in light of the October 2016 attacks in Maungdaw. The Commission notes that substantial progress has been made since the interim report on security cooperation and border issues, including a clear willingness to finalise the three MoU's which will formalize a deepening of Myanmar-Bangladeshi security cooperation. The Commission is of the opinion that this effort should be continued and intensified, and the implementation of the MoU's started as soon as possible.

82. The Commission takes note of the work of the Joint Trade Commission and encourages both governments to rapidly increase their bilateral trade. The Governments of Myanmar and Bangladesh could actively encourage more exchanges between civil society, think tanks, academics and the private sector to promote mutual understanding and cooperation.

REGIONAL RELATIONS

83. The Commission reiterates its recommendation that the Government of Myanmar should continue its initiative to brief ASEAN members on a regular basis on the broader dimensions and regional implications of the situation in Rakhine State. The Government of Myanmar should maintain a special envoy to engage with neighbouring countries on this issue.

84. The Government should recognize the interest of neighbouring countries in the situation in Rakhine State, and allow for full and frank discussion of the topic in regional fora.

IMPLEMENTATION OF THE COMISSION'S RECOMMENDATIONS

85. A ministerial level appointment should be made with the sole function of coordinating policy on Rakhine State and ensuring the effective implementation of the Rakhine Advisory Commission's recommendations. This should initially be a one-year appointment and the appointee should deliver public quarterly reports.

86. This one-year minister-level appointee should be supported by a permanent and well-staffed secretariat, which will be an integral part of the Central Committee on Implementation of Peace and Development in Rakhine State and support its work. The secretariat should contain secondees from the civilian and military branches of the Government, as well as individuals who reflect the diversity of the social fabric of Rakhine State.

87. The secretariat's staff should be in permanent consultation with groups in Rakhine State in the implementation of its work.

88. The secretariat should also manage the coordination of technical and financial support for the implementation of the Commission's recommendations.

রোহিঙ্গা সমস্যার গ্রন্থিমোচনে আনান কমিশনের প্রতিবেদন পথ দেখাতে পারে।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

উন্নয়ন নিবন্ধ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অগ্রযাত্রা

কমল চৌধুরী

ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় করতে এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে এদেশের মাটি ও মানুষের কল্যাণে স্বতন্ত্র রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'রূপকল্প-২০২১' এবং রূপকল্প-২০৪১' সফল করে তুলতে গণতন্ত্র ও সুশাসন সুনিশ্চিত করতে রেলপথ মন্ত্রণালয় জনকল্যাণে নানাবিধ কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত সাড়ে ৮ বছরের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০১১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর স্বতন্ত্র রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে প্রথম দায়িত্ব পান প্রয়াত সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। এরপর আওয়ামী লীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপি'কে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শেষাবধি প্রধানমন্ত্রী ২০১৩ সালে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন মো. মুজিবুল হক এমপিকে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রেলওয়ের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সেবামূলক সংস্থা। দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বল্প খরচে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য পরিবহণ সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে রেলওয়ে খাতে সরকারি বিনিয়োগ না হওয়ায় তা একটি দুর্বল সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার গঠনের পর হতে বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী, নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, নির্ভরযোগ্য ও যাত্রী সেবামূলক গণপরিবহণ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে যাচ্ছে।

একনজরে বাংলাদেশ রেলওয়ে

১৮৬২ সালে ১৫ই নভেম্বর দর্শনা-জগতি ৫৩.১১ কিমি. ব্রডগেজ লাইন চালুর মধ্য দিয়ে এদেশে রেলওয়ের যাত্রা শুরু হয়। এই রেলওয়ে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে নামে পরিচিত ছিল। ১৯৬১ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের নাম পরিবর্তন করে পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে রাখা হয়। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে বিলুপ্ত হয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে নামে আত্মপ্রকাশ করে। ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১১ বাংলাদেশ সরকারের অধীন নতুন রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিস্তৃতি	
সর্বমোট রেলপথের দৈর্ঘ্য	২৮৭৭ কিলোমিটার
মিটার গেজ	১৮০৮ কিলোমিটার
ব্রড গেজ	৬৫৯ কিলোমিটার
ডুয়েল গেজ	৪১০ কিলোমিটার।
বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্র্যাকের সর্বমোট দৈর্ঘ্য	৩৯৭৫.৮৬ কিলোমিটার
মিটার গেজ	২৪৪৩.৮৪ কিলোমিটার
ব্রড গেজ	৯৩২.৬২ কিলোমিটার
ডুয়েল গেজ	৪৮৪.০৫ কিলোমিটার।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের চিত্র	
রুট ছিল মোট	২৮৭৫.৮১ কিলোমিটার
মিটার গেজ	১৮৯৩.৮৯ কিলোমিটার
ব্রড গেজ	৯৮১.৯২ কিলোমিটার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০১৬ কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে নতুন আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস 'সোনার বাংলা এক্সপ্রেস' উদ্‌বোধনের পর তাপানুকূল বগিতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন –পিআইডি

বাংলাদেশ রেলওয়ের ডাবল লাইন নেটওয়ার্কের তথ্য			
ক্রমিক নং	সেকশন	রুট কিমি.	বিদ্যমান গেজ
১	ঢাকা-টঙ্গী	২৪	ডুয়েল গেজ
২	আখাউড়া-আশুগঞ্জ	২৬	মিটার গেজ
৩	চিনকি আস্তানা-চট্টগ্রাম	৬৯	মিটার গেজ
৪	দর্শনা-আব্দুলপুর	১০১	ব্রড গেজ
	মোট	২২০	

বাংলাদেশ রেলওয়ের ডুয়েল গেজ নেটওয়ার্কের তথ্য			
ক্রমিক নং	সেকশন	রুট কিমি.	নির্মাণ সমাপ্তির সন
১	ঢাকা-টঙ্গী	২৪	২০১০
২	টঙ্গী-জয়দেবপুর	১১.২৭	২০০৭
৩	জয়দেবপুর-পার্বতীপুর	৩৪৪	২০০৩
৪	পার্বতীপুর-সৈয়দপুর	১৫.১০	–
মোট		৩৯৪.৩৭	
মোট স্টেশনের সংখ্যা		৪৪৪ টি	

বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টকের পরিসংখ্যান	
মোট লোকোমোটিভের সংখ্যা	২৮৭টি (মিটার গেজ:১৯০ টি, ব্রড গেজ: ৯৭টি
যাত্রীবাহী কোচের সংখ্যা-মিটার গেজ	১১৬৫টি
যাত্রীবাহী কোচের সংখ্যা-ব্রড গেজ	৩২৪টি
ওয়াগনের সংখ্যা-মিটার গেজ	৭৭৯২টি
ওয়াগনের সংখ্যা-ব্রড গেজ	২০৮৭টি

বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল পরিসংখ্যান				
ক্রমিক নং	শ্রেণি	কর্মরত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা
১	১ম শ্রেণি	৪৪৬	৫৪৮	১০২
২	২য় শ্রেণি	৯৪৭	১৩৫৬	৪০৯
৩	৩য় শ্রেণি	১৪৬২৫	২১৮৭৬	৭২৫১
৪	৪র্থ শ্রেণি	১১৫১৭	১৬৪৮৪	৪৯৬৭
	মোট	২৭৫৩৫	৪০২৬৪	১২৭২৯

১৯৮২ সালে গঠিত এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুমোদিত জনবল ৬৮,৫২৪ জন। এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল কাঠামো–

বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল কাঠামো		
ক্রমিক নং	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ সংখ্যা
১	১ম শ্রেণি	৫৩০
২	২য় শ্রেণি	৮৪৫
৩	৩য় শ্রেণি	৩৭৯১৬
৪	৪র্থ শ্রেণি	২৯২৩৩
	মোট	৬৮৫২৪

প্রতিদিন চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা: ৩২৮টি।

প্রতিদিন চলাচলকারী মালবাহী ট্রেনের সংখ্যা: ৪৯টি।

রোলিং স্টক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ওয়ার্কশপ

লোকোমোটিভ মেরামত ওয়ার্কশপ:

১) কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
২) ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
৩) ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৪) ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ, ঢাকা।

ক্যারেজ ও ওয়াগন মেরামত ওয়ার্কসপ

১) সৈয়দপুর ক্যারেজ এন্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, সৈয়দপুর, নিলফামারী।
২) পাহাড়তলী ক্যারেজ এন্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

রেল ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ : ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত গত সাড়ে ৮ বছর মোট ৭৬ হাজার ২৯৩.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং ৪৭ হাজার ১৪৪.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩টি সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ৪০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়েতে ৪৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৭টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অর্থাৎ মোট ৫৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে চলমান অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) ৯ হাজার ২৭৮.০০ কোটি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে জিওবি: ৪৩০০.০৪ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৪ হাজার ৯৭৭.৯৬ কোটি টাকা। এছাড়া ৪৩ হাজার ৫৩৪.৭০ কোটি টাকার ১০৪টি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০০৯ থেকে ২০১৭ বিগত সাড়ে ৮ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ এবং অর্জিত সাফল্য:

রেলওয়ের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ : রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনসমূহ ডাবল লাইনে উন্নীত হলে এসব সেকশনে অধিকসংখ্যক ট্রেন পরিচালনা, সময়ানুবর্তিতা রক্ষা ও ট্রেন যাত্রার সময় হ্রাস করা সম্ভব হবে। এতে রেল সেবার আওতা আরও সম্প্রসারিত হয়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ শুরু করে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের দূরত্ব ৩২১ কিলোমিটার। তার মধ্যে ১১৮ কিলোমিটার ডাবল লাইন বিদ্যমান ছিল। ২টি প্রকল্পের আওতায় লাকসাম-চিনকি আস্তানা সেকশনে ৬১ কিলোমিটার এবং টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ৬৪ কিলোমিটার ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর ৩২১ কিলোমিটারের মধ্যে ২৪৩ কিলোমিটার ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল করছে। ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট লোনের আওতায় ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মে, ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৯৮.৫০%। এডিবি এবং ইআইবি'র অর্থায়নে আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ৭২ কিমি. ডুয়েল গেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মে, ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৩৮%। ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট লোনের আওতায় ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ রেললাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ড্রয়িং, ডিজাইন চূড়ান্তকরণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েল গেজ লাইন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে মূল নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। যমুনা নদীর ওপর বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ডুয়েল গেজ ডাবল ট্র্যাকসম্পন্ন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল লাইনে রূপান্তরের জন্য 'বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ২য় ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট-এর আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঈশ্বরদী-জয়দেবপুর সেকশন ডাবল লাইনে রূপান্তরের জন্য 'বাংলাদেশ রেলওয়ের জয়দেবপুর-ঈশ্বরদী সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি China সরকারের সাথে জি টু জি আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়নে China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) -এর সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন কার্যক্রম চলমান আছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ-জামালপুর সেকশন ডাবল লাইনে রূপান্তরের জন্য 'জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ-জামালপুর সেকশনে বিদ্যমান রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি China সরকারের সাথে জি টু জি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব CCEA

কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই Commercial Contract Negotiation-এর কার্যক্রম শুরু করা হবে।

রেলপথ পুনর্বাসন ও নতুন রেলপথ নির্মাণ : ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি ১ হাজার ৯১ কিমি. রেলপথ পুনর্বাসন, ২৪৩ কিমি. নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং প্রায় ২৪৯ কিলোমিটার মিটার গেজ রেললাইনকে ডুয়েল গেজ লাইনে রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে। জামালপুর জেলার তারাকান্দি থেকে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ৩৫ কিমি. নতুন রেললাইন স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০১২ তারিখ থেকে এ সেকশনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। ফরিদপুর জেলার পুকুরিয়া-ভাঙ্গা ৬.৬০ কিমি. রেলপথ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট-এর আওতায় খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত (৬৪.৭৫ কিমি. ব্রডগেজ) রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে; ঈশ্বরদী থেকে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন ৭৮.৮০ কিমি. রেললাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায়

যাত্রী সেবায় বাংলাদেশ রেলওয়ের নতুন সংযোজন ডেমু ট্রেন

ইতোমধ্যে কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাশিয়ানী থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত নতুন রেললাইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। তাছাড়া গোপালগঞ্জ থেকে গোবরা (টুঙ্গিপাড়া) পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এডিবি'র আর্থিক সহযোগিতায় চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মিয়ানমারের কাছে ঘুনধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে; ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু, ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা হয়ে যশোর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প' একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পায়রা সমুদ্রবন্দরকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থেকে বরিশাল হয়ে পায়রা সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 'আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েল গেজ রেল সংযোগ নির্মাণ (বাংলাদেশ অংশ)' শীর্ষক প্রকল্পটি গত বছরের ১৬ই আগস্ট একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ভারতীয় অনুদানে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত বছরের ২৩শে মার্চ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ থেকে concurrence পাওয়া গেছে। বর্তমানে জমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে। 'চট্টগ্রামের জানালীহাট স্টেশন-চুয়েট-কাপ্তাই পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' শীর্ষক সমীক্ষা প্রস্তাবটি গত বছরের ২৮শে ডিসেম্বর অনুমোদিত হয়। পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে দাখিলকৃত EOI মূল্যায়নাধীন আছে। যশোর জেলার নাভারণ থেকে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। বগুড়া থেকে নির্মিতব্য সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত নতুন ডুয়েল গেজ রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বগুড়া থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পটি ৩য় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে; আখাউড়া-সিলেট সেকশন ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য 'বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের বিদ্যমান মিটার গেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্পটি চীনা সরকারের অর্থায়নে জি টু জি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। 'ঢাকা-চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা/লাকসাম দ্রুতগতির রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন' শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; 'বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে সাবওয়ে নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা' শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

রোলিং স্টক সংকট নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম : বাংলাদেশ রেলওয়েতে লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের সংকট রয়েছে। এ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে :

ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ২০১১ সালে ৯টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে; জাইকা অর্থায়নে ২০১৩ সালে ১১টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ করা হয়েছে; ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের বিপরীতে রোলিং স্টক সংগ্রহকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে বেশ কিছু বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ২৬টি বিজি লোকোমোটিভ সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে। ১৬৫টি বিজি ট্যাংক ওয়াগন, ৮১টি এমজি ট্যাংক ওয়াগন এবং ২২০টি এমজি কন্টেইনারবাহী ফ্ল্যাট ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে। জিওবি অর্থায়নে ২০০টি এমজি এবং ৬০টি বিজি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় মোট ২৬০টি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন করা হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ করা হয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ঋণের আওতায় ১২০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ সরবরাহ পাওয়া গেছে; পদ্মা সেতু রেলসংযোগ প্রকল্পের আওতায় ১০০টি বিজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে। ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ২০টি, এডিবি অর্থায়নে ১০টি এবং সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের আওতায় ৭০টি এমজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান আছে। ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থায়নে ১৫০টি এমজি, টেন্ডারার্স ফিন্যান্সিং-এর আওতায় ২০০টি এমজি এবং এডিবি অর্থায়নে ২০০টি এমজি ও ৫০টি বিজি কোচ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৫০টি বিজি এবং ১৫০টি এমজি কোচ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৭৪টি কোচ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

রেলওয়ের প্রাথমিক যুগের কয়লাচালিত স্টিম ইঞ্জিন

সিগনালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম : বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনের মোট ৬৮টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। ফলে অধিকতর নিরাপত্তার সাথে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত হয়েছে। আরো ৫০টি স্টেশনের সিগনালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

নতুন ট্রেন চালুকরণ ও নতুন যাত্রীবাহী কোচ সংযোজন : ২০১৬ সালের ২৫শে জুন ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকার মধ্যে বিরতিহীন 'সোনার বাংলা এক্সপ্রেস' নামে নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। একই বছরের ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা-মোহনগঞ্জ রুটে আন্তঃনগর ট্রেন 'মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস' নামে আরো একটি নতুন ট্রেন উদ্‌বোধন করা হয়। ফলে ২০০৯ সালের শুরু থেকে অদ্যাবধি আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনসহ সর্বমোট ১০৬টি নতুন ট্রেন বিভিন্ন রুটে চালু করা হয়েছে এবং ৩০টি ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে। এছাড়া নতুন, আধুনিক ও উন্নতমানের যাত্রীবাহী কোচ আমদানির মাধ্যমে বিদ্যমান ট্রেনসমূহের পুরাতন যাত্রীবাহী কোচ পরিবর্তন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে মহানগর প্রভাতী, তুর্ণা এক্সপ্রেস, ঢাকা-সিলেট রুটে পারাবত এক্সপ্রেস, জয়ন্তীকা এক্সপ্রেস, উপবন এক্সপ্রেস, ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে তিস্তা এক্সপ্রেস, ঢাকা-খুলনা রুটে চিত্রা এক্সপ্রেস, ঢাকা-রংপুর রুটে রংপুর এক্সপ্রেস ইত্যাদিসহ বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনসমূহের বিদ্যমান পুরাতন কোচ পরিবর্তন করে নতুন কোচ সংযোজন করা হয়েছে। নতুন যাত্রীবাহী কোচ দিয়ে আরো ট্রেনের পুরাতন রেক পরিবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ভাড়া সমন্বয় : দীর্ঘদিন যাবৎ রেলওয়ের ভাড়া বৃদ্ধি না করার ফলে রেলওয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ এ সময়ে জ্বালানি তেলের মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি এবং সরকারি চাকরিজীবীদের কয়েক দফা বেতন বৃদ্ধির ফলে ট্রেনের পরিচালনা ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যায়। এজন্য রেলওয়েতে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের ভাড়া যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি অর্থাৎ সমন্বয় করে লোকসান হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

স্টেশন ও ট্রেনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি : রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনের অভ্যন্তরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হয়েছে। ট্রেনের টয়লেটে বৈদ্যুতিক আলো, পানি, সাবান, টিস্যু পেপার ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে এবং টয়লেটসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন স্টেশনে বিশ্রামাগার ও টয়লেট সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম স্টেশনসহ মোট ২৬টি স্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য Water Aid, Bangladesh-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন স্টেশনে পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে যাত্রী সাধারণ উন্নত সেবা পেয়ে রেলওয়েতে ভ্রমণে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডিজিটালাইজেশন : ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের অংশ হিসেবে রেলওয়েতেও ডিজিটাল সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে রেলওয়েতে যাত্রী পরিবহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ট্রেন ইনফরমেশন ডিজিটালাইজেশন : ট্রেনের অভিমুখ, ট্রেন ছাড়ার সময়, ট্রেনের অবস্থান, পরবর্তী স্টপেজ ইত্যাদি তথ্য মোবাইলে SMS-এর মাধ্যমে জানতে Train Tracking and Monitoring System (TTMS) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম : ট্রেন চলাচল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি ডিসপ্লে মনিটরের মাধ্যমে যাত্রী সাধারণের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে Computerized Train Information Display System প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ওয়াই-ফাই সিস্টেম স্থাপন : যাত্রীদের সুবিধার্থে ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রাম স্টেশনে ফ্রি ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে চলাচলকারী সুবর্ণ এক্সপ্রেস, তুর্ণা এক্সপ্রেস এবং মহানগর প্রভাতী ট্রেনে স্নিগ্ধা শ্রেণির যাত্রীদের সুবিধার জন্য ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে।

ই-টিকেটিং প্রবর্তন : যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট ক্রয়ের জন্য ই-টিকেটিং সুবিধা চালু করা হয়েছে।

কন্টেইনার ও মালামাল পরিবহণ বৃদ্ধি করা : রেলওয়ের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার একটি কন্টেইনার কোম্পানি গঠন করেছে। এ কোম্পানি কার্যক্রম শুরু করলে রেলওয়ের আয় উল্লেখযোগ্য হারে

রাজশাহী-খুলনা-রাজশাহী রুটে রেলওয়ের নতুন সংযোজন কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস

বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। এছাড়া প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আঞ্চলিক রেলযোগাযোগ পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে রেলওয়েতে মালবাহী ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা রেলওয়েকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশ রেলওয়েকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে যে বিশাল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন শুরু করেছে, তা সম্পন্ন হলে অচিরেই বাংলাদেশ রেলওয়ে আরো সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য গণপরিবহণে পরিণত হবে।

লেখক: সদস্য, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

উন্নয়ন ও সাফল্যের মহাসড়কে দিনাজপুর জেলা

মীর খায়রুল আলম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করছে বর্তমান সরকার। একই সাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালে একটি উন্নত দেশে পরিণত হতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার কারণে সাফল্য ত্বরান্বিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা দিনাজপুরে গত সাড়ে ৮ বছরে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিজিটালাইজেশন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নসহ জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ গতি সঞ্চারিত হয়েছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত দিনাজপুরের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এ জেলার বুক চিরে বয়ে গিয়েছে ছোটো-বড়ো অনেক নদী। আবহমানকাল ধরে কৃষি ক্ষেত্রকে ঘিরেই মূলত দিনাজপুরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। দিনাজপুর জেলার সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্যের কারণে এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এক বিশেষ অবস্থান গ্রহণ করেছে। দিনাজপুর জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মানসম্মত রেস্টহাউস ও ডাকবাংলো নির্মাণসহ বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ জেলার অবদানও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন ও আইসিটি কার্যক্রমের বিকাশের ফলে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে এ জেলার বিশেষ অবদান রয়েছে।

দিনাজপুর তোরণ

ভৌগোলিক সীমানা

দিনাজপুর জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত রংপুর বিভাগের একটি প্রশাসনিক জেলা। ভৌগোলিকভাবে এই জেলা ২৫°১০´ ও ২৬°০৪´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০৫´ ও ৮৫°২৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। মোট ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই জেলার আয়তন ৩,৪৪৪.৩০ বর্গকিলোমিটার (১৩২৯.৮৫ বর্গ মাইল)। এ জেলার মোট জনসংখ্যা ৩১,০৯,৬২৮ জন (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ২০১৬ সালে হালনাগাদকৃত); যার মধ্যে পুরুষ ১৫,৬৯,০০৬ জন এবং মহিলা ১৫,৪০,৬২২ জন। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত দিনাজপুর জেলার উত্তরে ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা, দক্ষিণে গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট জেলা, পূর্বে নীলফামারী ও রংপুর জেলা এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য।

নামকরণ

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের ছোটো নাগপুর, বিন্ধ্যা পর্বত প্রভৃতি প্রাচীন স্থানগুলোর মৃত্তিকার সমগোত্রীয় দিনাজপুরের মাটি। ভূতাত্ত্বিকভাবে হিমালয় পর্বতের সমকালীন সৃষ্টি বরেন্দ্র ভূমির হৃদয় ধরা হয় দিনাজপুরকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ জেলার গড় উচ্চতা ১১২ ফুট থেকে ১২০ ফুট। জনশ্রুতি অনুযায়ী, জনৈক 'দিনাজ' অথবা 'দিনারাজ' দিনাজপুর রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই নামানুসারে জেলার নাম হয় দিনাজপুর।

জেলার ইতিহাস

চৈনিক ও ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের বর্ণনা অনুযায়ী, করতোয়া নদীর তীরে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ধারণা করা হয়, মধ্যযুগে মহাস্থান ও বানগড় এবং মোগল যুগে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটই ছিল এই প্রাচীন সভ্যতার প্রধান নাগরিক কেন্দ্র। ইতিহাসখ্যাত পঞ্চনগরী দিনাজপুরেই অবস্থিত ছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করে মুসলিম বিজেতা বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ সালে বরেন্দ্র ভূমি জয় করে দিনাজপুরের দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করেন। ১২২০ সালে গৌড়ে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেবকোটই ছিল মুসলিম বাংলার রাজধানী।

চেহেলগাজীগণ দিনাজপুরের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজা গোপালের সময় ইসলামের বার্তা নিয়ে চেহেলগাজীদের আবির্ভাব হয়। ন্যায়ের স্বার্থে রাজার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে তাঁরা নিহত হন। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় ৪০ জন। দিনাজপুর শহরের উত্তরে তাঁদের ৫৪ ফুট দীর্ঘ সমাধিস্থলটি 'চেহেলগাজীর মাজার' নামে পরিচিত। ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দে চেহেলগাজীর মাজারে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি অনুসারে, দিনাজপুর শহরসহ উত্তরাংশের শাসনতান্ত্রিক এলাকার শাসনকর্তা নসরত উলুখ নসরত খাঁন চেহেলগাজী মাজারের পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন মসজিদ বলে চিহ্নিত।

দিল্লি শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সুরক্ষায় ইলিয়াস শাহ্ কর্তৃক নির্মিত ঐতিহাসিক একডালা দুর্গের অবস্থানও ছিল দিনাজপুরের মধ্যেই। গৌড়ের মসনদে আরোহণকারী রাজা গণেশ দিনাজপুরের অধিবাসী ছিলেন। গণেশ পুত্র গৌড়ীয় সুলতান বরবক শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী ঘোড়াঘাটে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে এক মুসলিম নগরীর গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীকালে এটি বিখ্যাত 'ঘোড়াঘাট সরকার' নামে পরিচিত হয়। 'জিন্দাপীর' নামে অভিহিত ইসমাইল গাজী ও বহু আউলিয়ার মাজার এবং হোসেন শাহী আমলের বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলাম প্রচারকের মাজার দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

মোগল আমলে বাংলা বিজয়ের পর সমগ্র বাংলাদেশকে ২৪টি সরকারে ভাগ করা হয়। এতে দিনাজপুরে ঘোড়াঘাট, বরকাবাদ, তাজপুর এবং পিঞ্জরা নামের ৪টি সরকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সবদিক বিবেচনায় বাংলার ঘোড়াঘাট মোগল আমলের শ্রেষ্ঠ

একনজরে দিনাজপুর জেলার পরিসংখ্যান

আয়তন	৩,৪৪৪.৩০ বর্গ কিমি. (৩২৯.৮৫ বর্গমাইল)
লোকসংখ্যা	৩১,০৯,৬২৮ জন (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী Adjusted-২০১৬)
পুরুষ	১৫,৬৯,০০৬ জন
মহিলা	১৫,৪০,৬২২ জন
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২২%
নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা	১০৯৫১৮ জন
উপজেলার সংখ্যা	১৩টি (বোচাগঞ্জ, বিরল, কাহারোল, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর সদর, খানসামা, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ী, পার্বতীপুর, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট)
পৌরসভার সংখ্যা	৯টি
সিটি কর্পোরেশন	নেই
ইউনিয়নের সংখ্যা	১০৩টি
গ্রামের সংখ্যা	২,১৩১টি
মৌজার সংখ্যা	১,৯২৬টি
থানা	১৩টি
হাটবাজার	২৭৩টি
নদী	১৯টি
মোট পরিবারের (খানা) সংখ্যা	৬,৪৭,৫০০টি
প্রতি বর্গ কিমি.-এ লোকসংখ্যার ঘনত্ব	৮৬৮ জন (প্রায়)
কৃষক পরিবারের সংখ্যা	৪,৮০,৭৫৬টি
ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা	১,৪০,৩২৫টি (৩০%)
ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার	৭৯,০৮৬টি (১৭%)
প্রান্তিক কৃষক পরিবার	১,৭৪,২৭৯টি (৩৬%)
মাঝারি কৃষক পরিবার	৬৯,৩৮৭টি (১৩%)
বড়ো কৃষক পরিবার	১৭,৬৭৯টি (৫%)
খাদ্য চাহিদা	৪,৮৮,৫২৯ মে. টন
মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন	১৩,০৩,৯২৩ মে. টন
উদ্বৃত্ত খাদ্য	৮,১৫,৩৯৪ মে. টন
কৃষি শস্য ও ফলমূল	
প্রধান কৃষি শস্য	ধান, গম, ইক্ষু, পাট, আলু, সবজি, পিঁয়াজ, আদা, তৈলবীজ
প্রধান ফলমূল	লিচু, আম, কলা, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল
বনভূমি	
মোট বনভূমি	৭,৬৪১.২২ হেক্টর
রিজার্ভ বনভূমি	৪,৬৮৫.৪০ হেক্টর
ভেস্টেড বনভূমি	২,৪৯৭.১৬ হেক্টর
একোয়ার্ড বনভূমি	৩৫২.৮৫ হেক্টর
খাস বনভূমি	১১৫.৮১ হেক্টর
নার্সারি	
সরকারি নার্সারি	৫টি
ব্যক্তিগত নার্সারি	১৮৩ টি
উপজেলা নার্সারি	১৯টি
শিক্ষা সংক্রান্ত	
শিক্ষার হার	৫২.৪%
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	১টি
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১টি
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	১টি
টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট	১টি
আইন মহাবিদ্যালয়	১টি
কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট	১টি
সরকারি কলেজ	৩টি
বেসরকারি কলেজ	৮৬টি
মাদ্রাসা	৩৫০টি
পি.টি.আই.	১টি
সরকারি বিদ্যালয়	১০টি
বেসরকারি বিদ্যালয়	৪২৬টি
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭২৭টি
আনরেজি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬টি
ভিটিআই	২টি
বিকেএসপি	১টি
সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ	১টি
হোমিও কলেজ	১টি
বিএড কলেজ	১টি
ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	১টি
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১টি
নার্সিং কলেজ	১টি
যোগাযোগ ব্যবস্থা	
পাকা রাস্তা	৬৯১ কিমি.
আধা পাকা রাস্তা	২৯৫ কিমি.
কাঁচা রাস্তা	৪,৭২০ কিমি.
রেলপথ	১৪২.০২ কিমি.
রেলস্টেশন	১৮টি

আবাদি ও ফসলি জমি	
আবাদকৃত জমি	২,৮৮,৪৩২ হেক্টর
নিট ফসলি জমি	২,৮৮,৪৩২ হেক্টর
এক ফসলি জমি	১৩,৮১৮ হেক্টর
দুই ফসলি জমি	২,১৭,৪৭৭ হেক্টর
তিন ফসলি জমি	৫৩,৩৬৭ হেক্টর
তিনের অধিক ফসলাধীন জমি	১৭০ হেক্টর
মোট ফসলি জমি	৬,০৯,৫৫৩ হেক্টর
ফসলের নিবিড়তার হার	২১৪%
উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	৬,০০,৪৬০.০০ মে টন
রোপা আমনের আবাদের লক্ষ্যমাত্রা	২,৪৬,০০০ হেক্টর
ক) উফশি	২,১৭,০০০ হেক্টর
খ) স্থানীয়	২৯,০০০ হেক্টর
আবাদ অর্জন	২,৫০,৯২০ হেক্টর
চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ	৬৮৫ হেক্টর
ভূমি সংক্রান্ত তথ্য	
পৌর এলাকায় জমির পরিমাণ	৮,০৪৮ একর
ভূমিহীন	৩০%
প্রান্তিক কৃষক	৩৬%
মাঝারি কৃষক	১৩%
বড়ো কৃষক	৫%
মাথাপিছু আবাদি জমি	০.০৫ শতাংশ
ইউনিয়ন/ পৌর ভূমি অফিস	১০৫টি
উপজেলা ভূমি অফিস	১৩টি
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও লোকসংখ্যা	
মসজিদ	৪,০৩৮টি
মন্দির	৯০৪টি
গির্জা	৯৬টি
প্যাগোডা	১৮টি
মুসলমান	২১,০৫,৬৮৪ জন (৭৬.৬৪%)
হিন্দু	৫,৬৫,৪৩৫ জন (২০.৫৮%)
খ্রিষ্টান	২১,৯৫২ জন (০.৭৯%)
বৌদ্ধ	৩,০৫০ জন (০.১১%)
অন্যান্য	৫১,৩৭৯ জন (১.৮৬%)
পেশাভিত্তিক বিন্যাস	
কৃষি	৪২.৮৫%
কৃষি শ্রমিক	২৯.১৯%
শ্রমিক	২.৪৮%
ব্যবসা	১০.২০%
পরিবহণ শ্রমিক	১.৬৭%
চাকরি	৫.৫৮%
শিল্প ও খনিজ	
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১টি
কঠিন শিলা প্রকল্প	১টি (মধ্যপাড়া)
কয়লা খনি প্রকল্প	১টি (বড়পুকুরিয়া)
লোকমোটিভ কারখানা	১টি (পার্বতীপুর)
চিনিকল	১টি (সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লি.)
টেক্সটাইল মিল	১টি
অটোমেটিক চাউল কল	৬১টি
সেমি অটোমেটিক চাউল কল	৩৫টি
চাতাল চাউল কল	১৮৬১টি
মেজর চাউল কল	১২টি
অটোমেটিক ফ্লাওয়ার মিল	৬টি
হিমাগার	৯টি
জুট মিল	১টি
লজেন্স ফ্যাক্টরি	২টি
গার্মেন্টস	১টি
মিশ্র সার ফ্যাক্টরি	১টি
পোলট্রি হ্যাচারি	৪টি
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত	
মোট উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স	১৩টি
মোট ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র	১০৫টি
মোট বেসরকারি ক্লিনিক	২৮টি
স্যানিটেশনের হার	৯৫.৫৭% (জুন ২০১৭ পর্যন্ত)
বন্দর ও অন্যান্য	
স্থলবন্দর	২টি (হিলি-হাকিমপুর ও বিরল)
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১টি
ব্যাংক শাখা	১৬৮টি
এনজিও'র সংখ্যা	৭৬টি (তালিকাভুক্ত)
আবাসন প্রকল্প	৪০টি
আশ্রয়ণ প্রকল্প	৫২টি
আদর্শ গ্রাম/ গুচ্ছগ্রাম	২৯টি
আন্তঃউপজেলা খেয়াঘাট	২টি
নির্বাচনি এলাকা	৬টি
মোট ভোটার সংখ্যা	১৮,৫৬,৩৪৫ জন
পুরুষ	৯,২২,৮৮১ জন
মহিলা	৯,৩৩,৪৬৪ জন
প্রধান রপ্তানি পণ্য	ধান, চাল, গম, আম, লিচু, কাঁঠাল, গুড়, ইক্ষু
দর্শনীয় স্থান	কান্তজিউ মন্দির, স্বপ্নপুরী, রামসাগর, সীতাকোট বিহার, সিংড়া ফরেস্ট, নয়াবাদ মসজিদ, সুরা মসজিদ ইত্যাদি।

প্রতিবেদন : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

সরকার ছিল। ইংরেজ সেনারা পলাশী যুদ্ধের ৮ বছর পর ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এ এলাকা জয় করে। এর ফলে পতন হয় সাবেক রাজধানী ঘোড়াঘাট নগরের। ইংরেজদের শাসনে গড়ে উঠতে থাকে দিনাজপুর শহর।

জেলা কালেক্টরেটের ইতিবৃত্ত

বর্তমান বাহাদুর বাজারস্থ গোলকুঠি বাড়িতে দিনাজপুরের সর্বপ্রথম নিজস্ব কালেক্টরেট ভবন নির্মিত হয় কালেক্টর মি. এইচ জে হ্যাচ -এর আমলে (১৭৮৬-১৭৯৩)। জেলা কালেক্টরেট নির্মিত হওয়ার পাশাপাশি সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় দিনাজপুর শহর তখন ক্রমান্বয়ে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময়ে রেডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে, এ জেলার ১০টি থানা নিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠন করা হয়। এসময় পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুঁড়ি জেলা থেকে তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম থানা দিনাজপুরের সাথে যুক্ত করা হয়। পাকিস্তান আমলে পাটগ্রাম থানাটি রংপুরের সাথে এবং দিনাজপুরের দক্ষিণ অংশের ধামইর, পোরশা ও পত্নিতলা থানা তিনটি তৎকালীন রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমার সাথে যুক্ত করা হয়। ১৯৮৪ সালে দিনাজপুরের দুটি মহকুমা ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় আলাদা জেলার মর্যাদা লাভ করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর থেকে অন্যান্য অঞ্চলের মতো দিনাজপুরের সর্বস্তরের জনতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। ২৫শে মার্চের কালরাত্রির প্রতিরোধ যুদ্ধের আগুন বিদ্যুৎগতিতে জ্বলে উঠেছিল ঢাকা, চট্টগ্রামের পরেই দিনাজপুরে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামের পরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল দিনাজপুরের কুঠিবাড়ি ব্যারাক থেকে। ঐ সময় দিনাজপুর-রংপুর জেলা সামরিক শাসনের সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স ছিল দিনাজপুর শহরের প্রাচীন কুঠিবাড়ি ভবনে। ২০শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর ফার্স্ট ফিল্ড কোম্পানির ১৫০ জন সেনা বিশেষ উদ্দেশ্যে দিনাজপুরে এসে বড়ো মাঠের বদলে সার্কিট হাউস চত্বরে ছাউনি ফেলে, যা আগে কখনো হয়নি। এছাড়া ২৩শে মার্চ প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবের কুচকাওয়াজে অভাবনীয়ভাবে ঐসব সেনাও অংশ

মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ

নেয় এবং তারা সার্কিট হাউস চত্বরেই অবস্থান করতে থাকে। ফলে বাঙালি জওয়ানদের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে। প্রজাতন্ত্র দিবসে কুঠিবাড়িতে আলাদা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাকিস্তানি সেনা অফিসার ও অবাঙালি ইপিআরগণকে ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় অস্ত্রসহ এবং বাঙালি ইপিআরগণকে অস্ত্র জমা দিয়ে সাদা পোশাকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বাঙালি জওয়ানদের একসঙ্গে বন্দি করার কৌশল হিসেবে তাদের আলাদা জায়গায় বসার ব্যবস্থা করা হয়। এ মতলব বুঝতে পেরে বাঙালি জওয়ানরা অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকার করেন। এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তানি সেক্টর কমান্ডার কর্নেল কোরেশী বাঙালি জওয়ানদের সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ না দিতে ভিন্ন পথ ধরলেন। পরের দিন ২৪শে মার্চ তিনি অর্ধেক বাঙালি জওয়ানকে ট্রাকে করে ঠাকুরগাঁয়ে এবং অবশিষ্টদের ১০ জনের দল করে সীমান্তে পাঠানোর জন্য জরুরি নির্দেশ দেন। বাঙালিদের মনোবল ভেঙে দিতে এ পরিকল্পনা করা হয়। এভাবে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হতে থাকে।

এ সময় দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে অ্যাডভোকেট আজিজার রহমান এমএনএ এবং অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ। এছাড়া জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে অন্যান্যের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ডা. ওয়াকিলউদ্দিন আহমদ এমএনএ, মোশাররফ হোসেন চৌধুরী এমএনএ এবং এম আব্দুর রহীম এমপি প্রমুখ। রাজনীতি নিরপেক্ষ অনেক বুদ্ধিজীবী এবং ব্যবসায়ীও মুক্তিযুদ্ধে একাত্ম হন। যুবকদের সমন্বয়ে শহরে কয়েকটি গুপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। এছাড়া আনসার ক্লাব, মুজাহিদ ক্লাব এবং শহর ও গ্রামের অনেক সংগঠন ও ক্লাবেও গোপনে গেরিলা প্রশিক্ষণের উৎসাহ দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে সৈয়দপুরে বিহারি-বাঙালি দাঙ্গা শুরু হয় এবং অনেক বাঙালি আহত-নিহত হয়। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার ফলে দিনাজপুরসহ সৈয়দপুরের চারদিকের গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবাদে দীর্ঘকালীন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহ মাহতাব বেগ সঙ্গীদের নিয়ে অসম সাহসে সৈয়দপুর সেনানিবাসের ওপর আক্রমণ শুরু করেন এবং শহিদ হন। এভাবে জনপ্রিয় নেতা মাহতাব বেগ মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুরে প্রথম শহিদ হন। কিছুদিনের মধ্যে দিনাজপুরে শুরু হয় আনুষ্ঠানিক প্রতিরোধ যুদ্ধ।

২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে শুরু হয় বর্বর গণহত্যা। ২৬শে মার্চ সকাল ১১টায় কারফিউ জারি হয় দিনাজপুর শহরে। শহরের পরিস্থিতি থমথমে, শহরবাসী গৃহবন্দি, সকল যোগাযোগ বন্ধ এবং জনসাধারণ ভীত-সন্ত্রস্ত। বাঙালি ক্যাপ্টেন নজরুল হক ও জেলা প্রশাসক ফয়েজউদ্দিন আহমদ সার্কিট হাউসে নজরবন্দি। পাঞ্জাবি, পাঠান ও বিহারিরা সারা শহরে টহল দিচ্ছিল।

তখন দশমাইল ছিল সারাদেশের সাথে সড়কপথে দিনাজপুরের প্রবেশপথ। ২৫শে মার্চের নৃশংসতার প্রতিবাদে ২৬শে মার্চ দশমাইল এলাকায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করতে যাওয়া মনু মিঞাসহ আরো পাঁচ জন তরুণকে কুঠিবাড়িতে ধরে আনা হয় এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে লাশ ঘাঘরার খাল পাড়ে ফেলে রাখা হয়। এ বীভৎস দৃশ্য দেখে কুঠিবাড়ির বাঙালি জওয়ানরা বিদ্রোহ করে। মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক এবং এমপি এম আব্দুর রহিমের 'কেবিএম কলেজ ক্যাম্প' নামক রচনায় ২৬শে মার্চ রাতে দক্ষিণ কোতয়ালীর গোদাগাড়ী হাটে একটি সভায় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবার তথ্য পাওয়া যায়।

দিনাজপুর জেলার উপজেলাভিত্তিক মৌলিক তথ্যাবলি-০১

উপজেলার নাম	আয়তন	জেলা শহর হতে দূরত্ব	ইউপি সংখ্যা	ইউনিয়ন	পৌরসভা সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মুসলিম	হিন্দু	খ্রিষ্টান	বৌদ্ধ	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী
সদর	৩৫৪.৭৩	০	১০	চেহেলগাজী, সুন্দরবন, ফাজিলপুর, শেখপুরা, শশরা, আউলিয়াপুর, উথরাইল, শংকরপুর, আক্করপুর, কমলপুর	১	২০৭	৪৮৪৫৯৭	২৪৭৭৯২	২৩৬৮০৫	৩৯৮১৫৫	৭৮০৫৮	৫৩১২	৬১	২৯৭১
বিরল	৩৫৩.৯৮	১০	১১	আজিমপুর, ফরক্কাবাদ, ধামইর, শরগ্রাম, বিরল, ভাতারা, বিজোড়া, ধর্মপুর, মঙ্গলপুর, রানীপুকুর, পলাশবাড়ী	১	২৩৮	২৫৭৯২৫	১৩০১৬০	১২৭৭৬৫	১৮৮৯০৯	৬৪৪৫৩	৯৩২	৭৭	৩৫৫৪
কাহারোল	২০৫.৫৩	২৩	৬	ডাবর, রসুলপুর, মুকুন্দপুর, তারগাঁও, সুন্দরপুর, রামচন্দ্রপুর	-	১৫২	১৫৪৪৩২	৭৭২৫৩	৭৭১৭৯	৮৩২৩৪	৬৮০৪৩	১২৪০	-	১৯১৫
বোচাগঞ্জ	২২৪.৭৯	৩০	৬	নাফানগর, ইশানিয়া, মুর্শিদহাট, আটগাঁও, ছাতইল, রনগাঁও	১	১৪১	১৬০০৪৯	৮০৪২৮	৭৯৬২১	৯৬০৮৬	৬০৬৮৪	১৬৩৮	৮৭	১৫৫৪
খানসামা	১৭৯.৭২	৫২	৬	আলোকঝাড়ী, ভেড়ভেড়ি, আংগারপাড়া, খামারপাড়া, ভাবকি, গোয়ালডিহি	-	৫৭	১৭১৭৬৪	৮৬৭৩১	৮৫০৩৩	১২৩৫৪৭	৪৭৫৭৩	৪৫৭	-	১৮৭
বীরগঞ্জ	৪১৩.১১	২৮	১১	শিবরামপুর, পলাশবাড়ী, শতগ্রাম, পাল্টাপুর, সুজালপুর, নিজপাড়া, মোহাম্মদপুর, ভোগনগর, সাতোর, মোহনপুর, মরিচা	১	১৮৭	৩১৭২৫৩	১৫৯৬১২	১৫৭৬৪১	২২১০১১	৮৮৫০৯	৪১১৪	৪৪	৩৫৭৫
চিরির বন্দর	৩১২.৬৯	১৮	১২	নশরতপুর, সাতনালা, ফতেজংপুর, ইশবপুর, আব্দুলপুর, অমরপুর, আউলিয়াপুকুর, সাইতাড়া, ভিয়াইল, পুনট্টি, তেঁতুলিয়া, আলোকডিহি	-	১৪২	২৯২৫০০	১৪৬৬১৯	১৪৫৮৮১	২২২৪০৮	৬৭০৩৭	৭০৬	-	২৩৪৭
পার্বতীপুর	৩৯৫.০৪	৩৫	১০	বেলাইচন্ডি, মন্মথপুর, রামপুর, পলাশবাড়ী, চন্ডিপুর, মোমিনপুর, মোস্তফাপুর, হাবড়া, হামিদপুর, হরিরামপুর	১	২৩০	৩৬৫১০৩	১৮৩৭৭২	১৮১৩৩১	৩১৩৫৩৪	৪৬০৭৭	২৭৫৩	১০	২৬২৯
ফুলবাড়ী	২২৮.৪৯	৪০	৭	এলুয়াড়ী, আলাদীপুর, কাজিহাল, বেতদিঘী, খয়েরবাড়ী, দৌলতপুর, শিবনগর	১	১৫২	১৭৬০২৩	৮৮৯৮৪	৮৭০৩৯	১৪৬০৬৫	২৩৬৫৫	৩২১৪	৬	৩০৮৩
বিরামপুর	২১২.৮৮	৫৬	৭	মুকুন্দপুর, কাটলা, খাঁনপুর, দিওড়, বিনাইল, জোতবানী, পলিগ্রয়াগপুর	১	১৬৯	১৭০৮০৬	৮৬৩৯৩	৮৪৪১৪	১৫৩০২৯	১০৩০৮	৪৮৭৯	২	২৫৮৮
নবাবগঞ্জ	৩১৪.৬৮	৬৬	৯	জয়পুর, বিনোদনগর, গোলাপগঞ্জ, শালখুরিয়া, পুটিমারা, ভাদুরিয়া, দাউদপুর, মাহমুদপুর, কুশদহ	-	২৭২	২২৯৩৩৭	১১৪৭৬৩	১১৪৫৭৪	২০১৩৮৩	১৬৫৪৬	৪৭২৯	৪২	৬৬৩৭
ঘোড়াঘাট	১৪৮.৬৭	৯৬	৪	বুলাকিপুর, পালশা, সিংড়া, ঘোড়াঘাট	১	১০২	১১৭৭৪০	৫৯০০১	৫৮৭৩৯	১০১০১৪	৭৩০২	৬০৬২	১৯	৩৩৪৩
হাকিমপুর	৯৯.৯২	৭২	৩	খট্টামাধবপাড়া, বোয়ালদাড়, আলীহাট	১	৮৩	৯২৫৯৯	৪৭১৬২	৪৫৪৩৭	৮৪৮৭৮	৫১০৪	১৩৭২	২৫	১২১৬
দিনাজপুর জেলা	৩৪৪৪.৩		১০১		০৯	২১৩১	৩১০৯৬২৮	১৫৬৯০০৬	১৫৪০৬২২	২৩৩৩২৫৩	৫৮৩৩৫৩	৩৭৪৮৮	৩৭৩	৩৫৬০১

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম, সিনিয়র সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ

দিনাজপুর জেলার উপজেলাভিত্তিক মৌলিক তথ্যাবলি-০২

উপজেলার নাম	মোট জমির পরিমাণ	বনভূমি	বিশ্ব বিদ্যালয়	মেডিক্যাল কলেজ	সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	এনজিও পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিক্ষিতের হার	মসজিদ	মন্দির	দৈনিক হাটবাজার	সরকারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	বিল/ জলাশয়
সদর	৩৪৬.৭৯	৪.৬৫	স-১	১	৩	১২	২	১৭৬	৩১	৬৪.৩	৭৩০	৮০	৯৭	৪	আমইর বিল
বিরল	৩৪১.১৩	১০.৭	-	-	-	৮	-	১৬৪	১৬	৪৭.৩	৬৫০	১২৭	৩৮	১	বহলা, ছাপইড়, দড়রা, ধামইর ও নাল বিল
কাহারোল	২০৪.১১	০.৫৪	-	-	-	৬	-	১১৭	১২	৫১.৩	৩১০	২৩৯	১৮	১	হাঁস বিল, কাঞ্চন বিল,
বোচাগঞ্জ	২২৪.১৪	০.৬৫	-	-	-	৬	-	১২৯	১০	৫২.৬	২৭৬	১৪৮	১০	১	চেংগন বিল, বাজনিয়া বিল, ঝেড়ঝেরিয়া বিল
খানসামা	১৭৭.১৩	-	-	-	-	৯	-	১৪০	১৪	৪৭.৫	৩৮০	৭৮	২৬	১	ডালবরি-১ ও ২, সাগুইকুড়ি, সিঙ্গিমারী-১ ও ২, কাশিরদলা, দুইসোয়া (তেপার মালো), নালবাড়ি ও কাঞ্চার বিল
বীরগঞ্জ	৪০০.৫৫	৭.০৭	-	-	-	৭	২	২১৫	১৩	৪৮.১	৫৫৯	২৭৫	৪৬	৩	লাল, পয়সা, চুনিয়া, পার্বতী, দাদেস্বরী, হাঁস, কাঞ্চন, বাঙ্কণভিটা, অর্জুনাহার, ভেড়ভেড়ী, হদিয়া ও চন্দ্রগর্ভ বিল
চিরিরবন্দর	৩০৯.০৯	-	-	-	-	১১	-	১৯৩	২৪	৫২.৯	৬৫২	১৮০	৩৫	১	ঘোড়ামারা বিল, ফেরুসাড়াঙ্গা বিল, গোয়ালদাড়া বিল
পার্বতীপুর	৩৮৫.৮৫	৯.১৯	-	-	-	৯	-	১৫৩	২৩	৫৩.৯	৭৬০	৩০৬	৫	২	মরনাই, দেবী দুবা, কাঞ্চনা, চারালকাটি, বড়খাল, পাঞ্চি রতন, বলাহার ও দোলাইকোটা বিল
ফুলবাড়ী	২২৭.১২	১.৩৭	-	-	১	৪	-	১০৮	৫	৫২.৬	৩৪৮	৫৪	৪	৪	আখার, শিংগরঘাড়ী, ভিমাইপুর, ঝরুর ও চেঘর বিল
বিরামপুর	২১২.৪৪	০.৪৪	-	-	-	৫	১	৯১	৮	৫১.৬	৩২০	১৯	২	১	আশুরার, দুবলারচর, নুনারদহ, আলতা দিঘী, চেংগড়, বোগঘর ও কোতুয়ার বিল
নবাবগঞ্জ	২৭০.০৬	৪৪.২৬	-	-	-	৭	-	১৪০	১৪	৪২.৮	৩৯২	১২	২৯	১	হেগাতেগা, দামাইল, বাঘাড়ুলি, দুর্গাদহ, বাকার, তিকানী, হাসখোলা, কচুয়া, বড়ালের, মুনাই, দামইর, খলিশাগাড়ী, কুঘর, বাঙ্কু, বেরাদগার, মোতাগারির, মীর্জাপুরম্যাচাব (মরা নদী), মনিষপাড়া, আশুরার ও পুর্নাদহ বিল
ঘোড়াঘাট	১৪৭.৫৮	-	-	-	-	৫	-	৫৮	৮	৪৬	২৩৮	২৯	৬	১	লালদহ বিল
হাকিমপুর	৯৯.৯২	-	-	-	-	২	১	৪৩	৭	৫৪.৭	১৪২	২৪	৩	১	-
দিনাজপুর জেলা	৩৩৪৫.৯৮		১	১	৪	৯১	০৬	১৭২৭	১৮৫	৫২.৪	৫৭৫৭	১৫৮১		২২	-

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম, সিনিয়র সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ

২৭শে মার্চ প্রবল প্রতিরোধের মধ্যে কুঠিবাড়ির অস্ত্রাগারের দখল নেয় বাঙালি জওয়ানরা। ৩০শে মার্চের মধ্যেই দিনাজপুর শহর শত্রুমুক্ত হয়। ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত ২২টি থানাসহ সমগ্র দিনাজপুর জেলা মুক্তাঞ্চল ছিল। ছাত্রলীগের জেলা সদস্যরা গণেশতলা অফিসে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল। এরমধ্যে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলোর সমন্বয়ে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় জনসাধারণের উপস্থিতিতে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। আহ্বায়ক নির্বাচিত হন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আজিজার রহমান এমএনএ। পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হন অধ্যাপক ইউসুফ আলী, অ্যাডভোকেট এম আব্দুর রহিম, অ্যাডভোকেট শাহ মাহতাব, অ্যাডভোকেট গোলাম রহমান, অ্যাডভোকেট এস এ বারী, অ্যাডভোকেট আজিজুল ইসলাম জগলু, অ্যাডভোকেট তেজেন নাগ, প্রাক্তন এমপি দুর্গামোহন রায়, গুরুদাশ তালুকদার, রফিক চৌধুরী, মির্জা আনোয়ারুল ইসলাম তানু, হবি চেয়ারম্যান, গোপাল ভৌমিক, ছগন লাল লোহিয়াসহ আরো অনেকে।

পিটার হেগেল হান্ট, উইলিয়াম ক্রলি, মার্ক টালি প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য সাংবাদিক ছাড়াও এ সময় বহু বিদেশি সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার সদ্যমুক্ত দিনাজপুরে প্রবেশ করেন। তাদের ধারণকৃত ভিডিও এবং সংবাদ বিবিসি'সহ সবকটি বিদেশি চ্যানেলে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারিত হওয়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবচিত্র পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠতে শুরু করে।

১৩ই এপ্রিল রাতেই সৈয়দপুর ঘাঁটি থেকে হানাদার বাহিনী বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও সাঁজোয়া বহর নিয়ে দিনাজপুর শহরের দিকে অগ্রসর হয়। সড়ক পথের পরিবর্তে একটি দল আসে রামডুবী হাট হয়ে মেঠোপথ ধরে চেহেলগাজীর দিকে। অপর একটি দল আসে রাজবাড়ি শালবনের ভেতর দিয়ে এবং তৃতীয় দলটি আসে পার্বতীপুর হয়ে মোহনপুরের পথে। তারা একসঙ্গে সুপরিকল্পিতভাবে শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে পিছু হটা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। হানাদারদের অবিরাম গুলিবর্ষণে বহু বাঙালি প্রাণ হারায়, আহত হয় অনেকে। সন্ধ্যা হবার আগেই সমস্ত শহর খালি হয়ে যায়।

তারপর থেকে মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্র গড়ে উঠতে শুরু করে প্রবাসী সরকারের তৎপরতায়। নিয়মিত মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পরাজিত হানাদারবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দিনাজপুরে বিজয় উৎসব উদ্‌যাপিত হয় তার চারদিন পরে অর্থাৎ ২০শে ডিসেম্বর। ১৭ই ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের আগেই দিনাজপুরের বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে বিজয়ী মুক্তিসেনারা বীরদর্পে শহরে এসে পৌঁছায়। মহান মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর ৬ ও ৭নং সেক্টরের অধীন ছিল। ৬নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম কে বাশার এবং ৭নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক ও মেজর কিউ এন জামান। ২০শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে গোর-এ-শহীদ বড়ো মাঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধে দেশ স্বাধীন হলেও দিনাজপুরের পথে-ঘাটে মাইন পোঁতা ছিল এবং শত্রুদের ফেলে যাওয়া অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্রও পড়ে ছিল যেখানে-সেখানে। তাই এসব

নদনদী

দিনাজপুর জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদনদীর নামের তালিকা ও অবস্থান

ক্র.নং	নদীর নাম	উৎপত্তি স্থল	দৈর্ঘ্য (কিমি.)
১	করতোয়া	ভারত	৬৮
২	আত্রাই	করতোয়া (খানসামা, দিনাজপুর)	৭৬
৩	কাঁকড়া	আত্রাই (ভূসির বন্দর, চিরিরবন্দর)	২৫
৪	ঢেপা	আত্রাই (জয়ন্তিকা, বীরগঞ্জ)	৩৮
৫	পূনর্ভবা	প্রাণনগর (৭ নং মোহাম্মদপুর ইউপি, বীরগঞ্জ)	৮৬
৬	গর্ভেশ্বরী	আত্রাই নদী (২ নং সুন্দরবন ইউপি, দিনাজপুর)	১৭
৭	ছোটো যমুনা	বড়ো চণ্ডীপুর বিল (পার্বতীপুর)	৫৬
৮	ইছামতি	ছাতিয়ানগড় বিল (খানসামা)	৬৫
৯	ভূল্লী	আটোয়ারী বিল এলাকা (পঞ্চগড়)	৪৮
১০	পাথরঘাটা	পলাশবাড়ী বিল এলাকা, বীরগঞ্জ	১৬
১১	নর্ত	সাতোর বিল এলাকা, বীরগঞ্জ	৮
১২	ছোটো ঢেপা	সাসলা পিয়ালা বিল (গড়েয়া, ঠাকুরগাঁও)	৩২
১৩	বেলান	শেওলাকুড়ি বিল (খানসামা)	২৫
১৪	নলসীশা	পাটিকা ঘাট বিল (পার্বতীপুর)	৩৬
১৫	তুলসিগঙ্গা	ধানপাড়া বিল (বিরামপুর)	২৬
১৬	চিরি	জোদ মাধুব বিল (বিরামপুর)	৯
১৭	তেঁতুলিয়া (তুলাই)	১ নং ডাবোর ইউনিয়নের ডাবরা মৌজার বিল এলাকা (কাহারোল)	৫৬
১৮	মাইলা	করতোয়া (মামুদপুর, নবাবগঞ্জ)	২৪
১৯	ভেলামতি	চিরিরবন্দর বিল এলাকা	১৬

মোট নদী ১৯টি, নদীপথের মোট দৈর্ঘ্য ৭২৪ কিমি.

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন, সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ

স্থান অস্ত্রমুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিদিন প্রত্যন্ত এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে মহারাজা হাইস্কুলে জড়ো করত। অস্ত্র সংগ্রহের এই কাজ চলাকালীন ৬ই জানুয়ারি, ১৯৭২ সন্ধ্যায় মাইন বিস্ফোরণে নিহত হন মহারাজা হাইস্কুল ভবনে অবস্থানরত প্রায় ৯০০ মুক্তিসেনা। পরের দিন উদ্ধারকৃত দেহাবশেষগুলো সামরিক মর্যাদায় চেহেলগাজীর মাজার প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর জেলার কত জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন, তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তবে শহিদদের অমর স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে নির্মিত হয়েছে শহিদ বেদি। সেই শহিদ বেদিতে জেলার ১৩৪ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রতি বছর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে কৃতজ্ঞ দিনাজপুরবাসী বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই শহিদ বেদিতে। বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা তৈরি ও ভাতা প্রদানের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। হিলি ও মোহনপুরসহ বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের সামনে নির্মাণ করা হয়েছে বহুতল বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স। এছাড়া সকল উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের স্থায়ী আবাসন কমপ্লেক্স তৈরির লক্ষ্যে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

দিনাজপুরের কৃষি

লিচু ও সুগন্ধি চাল দিনাজপুর জেলার প্রধান কৃষিপণ্য ও অর্থকরি ফসল। এ জেলায় বাংলাদেশের সেরা লিচু উৎপন্ন হয়। সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে লিচুর মুকুল বের হয় এবং মে-জুন মাসে লিচু পাকে। এ জেলায় বিভিন্ন জাতের লিচু উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মাদ্রাজি, বোম্বাই, বেদানা ও চায়না-৩। বর্তমানে লিচু চাষের

দিনাজপুর জেলার শস্যবিন্যাস

ক্র. নং	শস্য বিন্যাসের বিবরণ	শস্য বিন্যাসের অধীন জমির পরিমাণ (হেক্টর)	শস্য বিন্যাসের অধীন নিট জমির শতকরা হার
১	বোরো- পতিত - রোপা আমন	১৩৮৫৭৯	৪৮.৬০%
২	গম- পতিত - রোপা আমন	১৩৭২৩	৪.৮১%
৩	গম - পাট - রোপা আমন	৫৪৮০	১.৯২%
৪	গম-মুগডাল/সবুজ সার - রোপা আমন	২৭৭	০.১০%
৫	গম- রোপা আউশ- রোপা আমন	৩৪৯০	১.২২%
৬	আলু - ভুট্টা-পতিত- রোপা আমন	৩১২০	১০.৯২%
৭	আলু - বোরো - পতিত - রোপা আমন	১২৬৪৬	৪.৪৪%
৮	সরিষা- বোরো- পতিত - রোপা আমন	১২৮৫০	৪.৫১%
৯	বোরো- রোপা আউশ- রোপা আমন	৩৫০০	১.২৩%
১০	সরিষা-পাট- রোপা আমন	৭৯০	০.২৮%
১১	সরিষা- ভুট্টা - রোপা আমন	২২৫০	০.৭৯%
১২	শাকসবজি-আমন বীজতলা/ডাল ফসল	১৪২১০	৪.৯৮%
১৩	শাকসবজি- আলু- ভুট্টা- রোপা আমন	২০৫০	০.৭২%
১৪	শাকসবজি -বীজতলা- রোপা আমন	২৪৮৮	০.৮৭%
১৫	শাকসবজি- বোরো - রোপা আমন	৩৪০০	১.১৯%
১৬	ভুট্টা - পতিত - রোপা আমন	১৫৮৯২	৫.৫৮%
১৭	আখ/কলা/আদা/হলুদ	৫৬৯০	২.০০%
১৮	মশলা ফসল - পাট - রোপা আমন	৩২২৮	১.১৩%
১৯	ডাল ফসল - শাকসবজি - রোপা আমন	৬৮৭	০.২৪%
২০	ভুট্টা-পতিত / মশলা ফসল- পতিত	৭৭৫৩	২.৭২%
২১	অন্যান্য	৪৯৯৭	১.৭৫%
	মোট	২৮৫১০০	১০০%

প্রতিবেদন : মো. গোলাম রাব্বি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর

আওতায় মোট জমির পরিমাণ ১৫০০ হেক্টর (৩৭০৫ একর)। গড়ে ১ শতক জমিতে ১টি গাছ হিসেবে এ জেলায় প্রায় ৩,৭০,৫০০টি লিচু গাছ রয়েছে। প্রতি ফলন বর্ষে গড়ে প্রতি গাছে ৪০০০টি লিচু ধরে, এই হিসেবে লিচুর বার্ষিক ফলন ১৪৮,২০,০০,০০০ টি; যার বাজার মূল্য বার্ষিক প্রায় ৩৭০-৪০০ কোটি টাকা।

জাতভিত্তিক লিচুর উৎপাদন: বার্ষিক মোট উৎপাদনের ৩০% মাদ্রাজি, ৩৯% বোম্বাই, ৫% বেদানা, ২৫% চায়না-৩ এবং ১% কাঁঠালি বোম্বাই লিচু। মোট উৎপাদিত লিচুর প্রায় ২০% জেলায় ব্যবহার হয় এবং বাকি ৮০% বিক্রির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। এ জেলায় লিচু চাষের প্রধান প্রধান উৎপাদন এলাকা হলো– সদর উপজেলার কসবা, সৈয়দপুর, মাসিমপুর, মাহমুদপুর, নশিপুর ও জয়দেবপুর; বিরল উপজেলার মাধববাটি, রসুলশাহপুর, রানী পুকুর, মঙ্গলপুর, মাটিয়ান দিঘি, আজিমপুর, লক্ষ্মীপুর, জগতপুর ও রাজুরিয়া; বীরগঞ্জ উপজেলার চকাই, কল্যাণী, পাল্টাপুর, ধুলাউড়ি, মরিচা ও শিবরামপুর; চিরিরবন্দর উপজেলার গলাহার, আরাজি গলাহার, কাদরা, কৃষ্ণপুর ও জয়পুর এবং বিরামপুর উপজেলার শিমুলতলী, দূর্গাপুর, মামুদপুর ও মির্জাপুর ।

দিনাজপুরের বেদানা লিচু

সুগন্ধি চাল ও উচ্চ ফলনশীল ধান

সুগন্ধি ধান/চাল উৎপাদনে দিনাজপুর জেলা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ জেলায় নানা জাতের সুগন্ধি ধান জন্মে। তন্মধ্যে ব্রি ধান-৩৪, কাটারি, জিরা কাটারি (চিনিগুড়া), ফিলিপিন কাটারি, চল্লিশা জিরা, বাদশা ভোগ, কালোজিরা, জটা কাটারি, চিনি কাটারি, বেগুনবিচি ও ব্রি ধান-৫০ উল্লেখযোগ্য। একমাত্র ব্রি ধান-৫০ রবি বা বোরো মৌসুমে আবাদ হয়। অন্যান্য জাতের সুগন্ধি ধানগুলোর অধিকাংশ রোপা আমন মৌসুমে আবাদ হয়। আবাদকৃত জমির পরিমাণ প্রায় ৪০,৭৬৫ হেক্টর এবং বার্ষিক মোট চাল উৎপাদন প্রায় ৮৫,৪০৬ মে.টন।

অন্যান্য ফসল

দিনাজপুর জেলার আবহাওয়া গম ও ভুট্টা চাষের উপযোগী। এ জেলায় শতাব্দী, সৌরভ, গৌরব, প্রদীপ, বিজয় জাতের গম এবং হাইব্রিড-এনকে-৪০, প্যাসিফিক-১১/৯৮৪/৯৮৭, ব্র্যাক-৬০/৯৮৪, সোয়ান-২, প্রোলিন জাতের ভুট্টা আবাদ হয়। আলুর জাতসমূহের মধ্যে গ্রানুলা, মাল্টা, পেট্রোনিজ, ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেন্সিনা, ক্যারেজ, লেডিরোজ ইত্যাদি দিনাজপুরের কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয়। এছাড়া টরি-৭, বারি-৮, বারি-৯ ও বারি-১৫ জাতের সরিষা; ও-৯৮৯৭, ও-৪, বেঙ্গল বঙ্কিম, কিষান বন্ধু ও অ্যাটম-৩৮ জাতের পাট; বারি-৬ জাতের মসুর, বারি-৪ জাতের মাসকলাই, বারি-৪ জাতের মুগডাল, বারি-৩ জাতের খেসারি,

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী (এইজেড) দিনাজপুরের জমির আয়তন ও মাটির বৈশিষ্ট্য

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল	আয়তন (হেক্টর)	মাটির বৈশিষ্ট্য
AEZ-1, পুরাতন হিমালয় পাদভূমি, Old Himalayan piedmont plain	৮৫,৯৬৪	জমি-উঁচু, মাঝারি উঁচু, জৈব পদার্থ-কম, পিএইচ-৪.০-৬.০, বুনট- বেলে দোআঁশ, দোআঁশ পটাশিয়াম- কম।
AEZ-3, তিস্তা সর্পিল ভূমি Tista Meander Flood plain	৮৩,৪৪৪	জমি-উঁচু, মাঝারি উঁচু, জৈব পদার্থ- কম, পিএচ- ৪.৬-৬.৫, বুনট- দোআঁশ,পটাশিয়াম- মধ্যম
AEZ-25, সমতল বরেন্দ্র ভূমি Level Barind Tract	৮৮,৩২৩	জমি- উঁচু, মাঝারি উঁচু, মাঝারি নিচু, নিচু, জৈব পদার্থ- কম, পিএইচ- ৫.০-৫.৭, বুনট- দোআঁশ, পটাশিয়াম- কম
AEZ-27, উত্তর-পূর্ব বরেন্দ্র ভূমি North-Eastern Barind Tract	২৬,৮৬৯	জমি- উঁচু, মাঝারি উঁচু, জৈব পদার্থ-কম, পিএইচ- ৪.৮-৫.৬, বুনট- দোআঁশ, পটাশিয়াম- কম
মোট	২৮৪,৬০০	

তাহেরপুরী জাতের পেঁয়াজ এবং ডিমলা, দেবিপাট, পাটনাই ও খোচামুদি জাতের হলুদ দিনাজপুর জেলায় আবাদ হয়।

খাদ্য

দিনাজপুর জেলা বাংলাদেশের অন্যতম শস্যভাণ্ডার। এটি খাদ্য উদ্বৃত্ত অঞ্চল। ধান চাষ নির্ভর এই জেলা দেশের সিংহভাগ চালের জোগান দেয়। খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য এ জেলায় ১টি সিএসডি ও ২৫টি এলএসডি রয়েছে। সরকারিভাবে এ জেলায় ২০১৭ সালে বোরো মৌসুমে ৮৫৮৩৯ মে. টন সিদ্ধ চাল, ৮০৯৬ মে. টন আতপ চাল এবং ৪৫৬৮ মে. টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। অন্যান্য বছরের মতো এবারও সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে ।

দিনাজপুর জেলার প্রাণিসম্পদ

দিনাজপুর জেলায় একটি ভেটেরিনারি হাসপাতাল, একটি সরকারি হাঁস-মুরগির খামার, ছয়টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র (এফএএআই), ৫৭টি কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট (স্বেচ্ছাসেবী) এবং হাকিমপুর ও বিরল-এ দুটি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন রয়েছে।

জেলায় প্রাণিসম্পদ খামার

ক্রমিক নং	নিবন্ধিত খামারের বিবরণ	সংখ্যা	গবাদি প্রাণী/হাঁস-মুরগির সংখ্যা	
০১	বেসরকারি দুগ্ধ খামার	১০০৯	গরু	১০৪৩৪৩৬
০২	বেসরকারি হৃষ্টপুষ্ট খামার	৯২৬	মহিষ	৩৭৬৩
০৩	বেসরকারি ছাগল খামার	১১২	ছাগল	৯৯৪১৮৪
০৪	বেসরকারি ভেড়ার খামার	১৮	ভেড়া	১৫৫০৭১
০৫	লেয়ার খামার	৪৫৪	হাঁস	১৩৭২৮৭৯
০৬	ব্রয়লার খামার	৭৯৯	মুরগি	৪৪৮৭৫৬৬
০৭	গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক	০৩		
০৮	প্যারেন্ট স্টক	০৬		
০৯	হাঁসের খামার	৫৬		
১০	হ্যাচারি	০১		

জেলার শিক্ষা

দিনাজপুর জেলায় ১৭২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এনজিও পরিচালিত ১৮৫টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪২৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি সরকারি কলেজ, ৮৬টি বেসরকারি কলেজ, ৩৫০টি মাদ্রাসা, ২টি ভিটিআই, ১টি পিটিআই, ১টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, ১টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, ১টি ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ১টি সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ, ১টি হোমিও কলেজ, ১টি বিএড কলেজ, ১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি আইন মহাবিদ্যালয়, ১টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ১টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও ১টি সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া জেলায় বেশ কিছু স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে সেন্ট জোসেফ স্কুল, আমেনা বাকি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হলি ল্যান্ড কলেজ, রিজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইতোমধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। দিনাজপুর জেলার বর্তমান শিক্ষার হার ৫২.৪%।

বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং ৮ শতাধিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। মানসম্মত কন্টেন্ট তৈরি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনা বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। স্কুলে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান, নিয়মিত মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনা ও ড্যাশবোর্ডে তথ্য আপলোডিং কার্যক্রম তদারকি চলছে। দিনাজপুর জেলার প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডায়নামিক ওয়েবসাইটের আওতায় এসেছে। শিক্ষার্থীদের নোটিশ, হাজিরা, ফলাফল তৈরি ও প্রকাশ ইত্যাদি অনলাইনে সম্পন্ন করে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দিনাজপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০১৩ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

খনিজ সম্পদ

দিনাজপুর জেলা খনিজ সম্পদের জন্য বিখ্যাত। এ জেলার বড়পুকুরিয়া ও ফুলবাড়িতে ২টি কয়লা খনি ও মধ্যপাড়ায় ১টি কঠিন শিলা খনি

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ড. এম. এ. ওয়াজেদ ভবন

আছে। বর্তমানে পার্বতীপুরের মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)-এর মাধ্যমে কঠিন শিলা এবং বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)-এর মাধ্যমে কয়লা উত্তোলনের কাজ চলছে।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি

পার্বতীপুর উপজেলায় ১৯৮৫ সালে আবিষ্কৃত বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিটির আয়তন ৩ বর্গ কিমি. ও গভীরতা ১১৮ মিটার থেকে ৫০৯ মিটার। এটি দেশের বৃহত্তম কয়লা খনি। খনিটিতে কয়লার মোট মজুত ৩৯০ মিলিয়ন মে. টন এবং উত্তোলনযোগ্য মজুত ৬৪ মিলিয়ন মে. টন। ২০০৫ সালে এ খনি থেকে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন ৩,৩০০ মে. টন কয়লা উৎপাদন করা হচ্ছে ।

মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি

ফুলবাড়ি উপজেলায় ১৯৭৪ সালে আবিষ্কৃত মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ১৮০.০৪৭০ একর। খনিটির গভীরতা ১২৮ মিটার। এ খনি এলাকার আয়তন ১.২০ বর্গ কিমি. এবং উত্তোলনযোগ্য মজুত ১৭৪ মিলিয়ন মে. টন। ২০০৭ সালের ২৫শে মে খনি থেকে বাণিজ্যিকভাবে পাথর উৎপাদন শুরু হয়। এখন দৈনিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫৫০০ মে. টন। বর্তমানে মধ্যপাড়া খনি থেকে উত্তোলিত কঠিন শিলা পদ্মা সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানা

শিল্পকারখানায় সমৃদ্ধি যে-কোনো অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম পূর্বশর্ত। শিল্পকারখানার সমৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক কাঠামো। কৃষি সমৃদ্ধ দিনাজপুর জেলাতে প্রধানত কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। দিনাজপুর জেলায় ভারী শিল্পকারখানার মধ্যে সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লি. এবং দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস লি. অন্যতম। এছাড়া মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে অটো রাইস মিল, ফ্লাওয়ার মিল ও পোলট্রি হ্যাচারি অন্যতম। দিনাজপুর জেলায় একটি কৃষিভিত্তিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, ফুলবাড়ি

রামসাগর

সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড

দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনি শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) পরিচালিত একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ১৯৩৩ সালে এর অবকাঠামো নির্মাণ ও উৎপাদন শুরু হয়। ১৯৮০ সালে বন্ধ হয়ে ১৯৮২–৮৩ অর্থবছরে পুনরায় কারখানাটি চালু হয়। এ কারখানার মোট জমির পরিমাণ ৩,৮৬০ একর। প্রতিদিন ইক্ষু মাড়াই ক্ষমতা ১২৫০ মে. টন।

দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

দিনাজপুর জেলা সদর থেকে ১৯ কিমি. দূরে দিনাজপুর-ঢাকা মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে সদরপুর এলাকায় দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা উত্তরকালে উত্তরবঙ্গের সুতার চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত আগ্রহে এই সরকারি মিলটি স্থাপিত হয়। মিলটি ৩৬.৫৪ একর জমির ওপর অবস্থিত।

মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা

ধান দিনাজপুর জেলার প্রধান কৃষিপণ্য হওয়ায় এই জেলায় শিল্পকারখানা বলতে প্রায় ২০০০ চালকল গড়ে উঠেছে; যার মধ্যে প্রায় ২০০টি অটোমেটিক ও সেমি-অটোমেটিক চালকল রয়েছে। অবশিষ্ট সবগুলো চাতাল নির্ভর চালকল। এছাড়া ৬টি অটোমেটিক ফ্লাওয়ার মিল, ৯টি হিমাগার, ১টি জুট মিল, ২টি লজেন্স ফ্যাক্টরি, ১টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, ১টি মিশ্র সার ফ্যাক্টরি ও ৪টি পোলট্রি হ্যাচারি রয়েছে। ।

জেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১-এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দিনাজপুর জেলায় ব্যাপক কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে ১০৩টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং ৯টি পৌর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এসব ডিজিটাল সেন্টারে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মডেম, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ফটোকপিয়ারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ, সংরক্ষণ এবং এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে উদ্যোক্তাগণ সরকারি-বেসরকারি প্রায় ১০০ ধরনের সেবা প্রদানের পাশাপাশি আগ্রহী তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় ই-সেবা কার্যক্রমের আওতায় অনলাইনে সেবার আবেদন, নথি, প্রয়োজনীয় অ্যাপস, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য হালনাগাদকরণ, অনলাইন চালান যাচাইকরণ, অনলাইন আয়কর পরিশোধ ও ভিসা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। জেলা ই-সেবা কেন্দ্রের আওতায় নাগরিক আবেদন, নকলের জন্য আবেদন ও নথির বা আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানা যাচ্ছে। জেলার অন্যান্য ই-সেবার মধ্যে রয়েছে ই-ডিরেক্টরি, শিক্ষক বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, এনজিও পোর্টাল dinajpurngos.com, জেলা প্রশাসন ফেসবুক পেজ, ই-রিপোর্টিং পোর্টাল, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ইমাম বাতায়ন, অনলাইনে হোটেল-আবাসন বুকিং, জেলা পোর্টাল মোবাইল অ্যাপস্ এবং ইনোভেশন কর্নার ইত্যাদি।

নাগরিকদের অভিযোগ নিস্পত্তি কার্যক্রম নিশ্চিতকল্পে দিনাজপুরে তৈরি করা হয়েছে ই-কমপ্লেইন্ট কেয়ার পোর্টাল। এছাড়া সেকেন্ড জেনারেশন সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, ই-ফাইলিং কার্যক্রম গ্রহণ, সমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল তৈরি, নিয়মিত হালনাগাদকরণ ও পোর্টালের মোবাইলবান্ধব অ্যাপস তৈরি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সার্কিট হাউসে ওয়াই-ফাই সংযোগ, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহণ, সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রমসমূহকে মনিটরিং, জেলার সকল সভার সদস্যগণকে এসএমএস-এর মাধ্যমে নোটিশ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম চালু রয়েছে।

আইসিটিতে আগ্রহী তরুণ-তরুণীদের জন্য জেলা প্রশাসন একটি প্লাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে। অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে আয় করার জন্য 'ঘরে বসে আয় করুন' প্রকল্পে প্রায় ৩০০০ বেকার তরুণ-তরুণীকে জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ৯০০ জন ফ্রিল্যান্সার এখন ঘরে বসে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়মিত আয় করছে। ইতোমধ্যে চিরিরবন্দর উপজেলায় 'ক্লিপিং বিডি' নামক অনলাইন ভিত্তিক আয়ের একটি মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দুরন্ত বাজার, আইটি সলিউশন, দিনাজপুর আইটি, রাফু সফ্‌ট, দ্বীনি সফট্, আইসিটি ক্লাব দিনাজপুরসহ অনেক ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে ই-কমার্সের চমৎকার বাজার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দিনাজপুর জেলায় www.dinajpur.gov.bd ওয়েবসাইট স্থাপন এবং ১৩টি উপজেলা ও ১০৩টি ইউনিয়নের তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব-পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। দাপ্তরিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গতিশীলতা আনয়নে এ জেলায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। জেলায় ১৫টি ফেইসবুক পেজের মাধ্যমে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সেবাবান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম ইত্যাদি তুলে ধরা হচ্ছে। এছাড়া নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ-২ জেলা প্রশাসনের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল মেকানিক পুল গঠন

দিনাজপুর জেলার ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র, পৌরসভা তথ্য ও সেবাকেন্দ্র এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক কম্পিউটার সামগ্রী, ফটোকপিয়ারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়মিত মেইনটেন্যান্স এবং সচল রাখার জন্য কম্পিউটারে দক্ষ নির্বাচিত ২২ জনকে নিয়ে একটি বিশ্বস্ত ডিজিটাল মেকানিক পুল গঠন করা হয়েছে।

ডিজিটাল রেকর্ড রুম

সকল রেকর্ড রুমের ১০০% ROR সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস এবং জেলা

রেকর্ড রুমের প্রায় ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার বিনষ্ট খতিয়ান পুনঃলিখনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

দিনাজপুর জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জরাজীর্ণ ছেড়া রেজিস্টারসমূহের হোল্ডিং তথ্য নতুন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষে জেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌরভূমি অফিসে ১০০ রেজিস্টার-২ (তলববাকি রেজিস্টার) স্থানীয়ভাবে ছাপিয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। সকল উপজেলায় ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিস এবং আর এম শাখার জন্য ৫০ বছরের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে ব্যবহার উপযোগী সিভিল স্যুট রেজিস্টার, রেজিস্টার-৮, রেজিস্টার-২২, মুভমেন্ট রেজিস্টার ও পরিদর্শন রেজিস্টার এবং ৩০ বছরের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে ব্যবহার উপযোগী সায়রাত রেজিস্টার (সকল সায়রাত তালিকাভুক্ত করে) স্থানীয়ভাবে ছাপিয়ে বাঁধাই করে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া সকল উপজেলা ভূমি অফিসের জন্য এস এ শাখার অডিট আপত্তি রেজিস্টার সরবরাহ করা হয়েছে। রেকর্ড রুম এবং পিআরআর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেকর্ড রুমের সকল কাগজপত্রের তালিকাভুক্তির কাজ শেষের দিকে। এর ফলে ২০০ বছরের উর্ধ্বের সকল দলিল/কাগজ সুবিন্যস্ত হবে। পিআরআর রেকর্ড রুমও সাজানো হয়েছে। ডিএলএমএস প্রকল্পের আওতায় জেলার সকল সিএস, এসএ এবং আরএস খতিয়ানসহ নামজারি খতিয়ান স্ক্যান করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের আওতায় জেলার সকল উপজেলা ভূমি অফিসে অনলাইনে নামজারি কার্যক্রম ও ম্যাপ প্রিন্টিং কার্যক্রম চলমান আছে।

ডিজিটাল সেবায় অন্যান্য অর্জন

ক) জেলায় শতভাগ অনলাইন জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

খ) ই-মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। এজন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল কোর্ট ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের নথি ব্যবস্থাপনা, গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও রেজিস্টার সংরক্ষণের জন্য আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন রেজিস্টার ছাপিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের কাছে সরবরাহ করা হয়।

গ) দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, জেলার কৃষি ও কৃষক, গ্রাম-পুলিশ, নৃগোষ্ঠীসহ জেলার সার্বিক বিষয়সমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সকল শ্রেণির মানুষের কাছে দিনাজপুরের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে জেলা প্রশাসন ইতোমধ্যে প্রায় ১৩টি প্রকাশনা বের করেছে। প্রকাশনাসমূহ জেলা তথ্য বাতায়নের http://www.dinajpur.gov.bd/node/1251611 লিংকে পাওয়া যাচ্ছে।

তরুণ শিক্ষার্থীদের আইসিটিতে দক্ষ ও বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তোলা এবং তাদের আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিবেট ক্লাব, পরিবেশ ক্লাব, বিজ্ঞান ও আইসিটি ক্লাব এবং সাংস্কৃতিক ও আবৃত্তি ক্লাব গঠন করা হয়েছে। প্রতিবছর জেলা পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উদ্‌যাপিত হয়। এভাবেই দুরন্ত গতিতে চলমান রয়েছে ডিজিটাল দিনাজপুরের কার্যক্রম।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চিত্র

দিনাজপুর জেলায় বর্তমান সরকারের সাড়ে ৮ বছরে উল্লেখযোগ্য যেসকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়েছে তার একটি তালিকা নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো।

বর্তমান সরকারের আমলে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	দিনাজপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৭৯৭১.৭৭	গণপূর্ত বিভাগ, দিনাজপুর
২	দিনাজপুর ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভবন নির্মাণ(১ম পর্যায়ে ২৫০ শয্যা)	৬৭২২.২৪	
৩	চিফ জ্যুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন নির্মাণ প্রকল্প	২০৬৮.৫৫	
৪	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ/বিরামপুর/হিলি স্থলবন্দর/কাহারোল/চিরিরবন্দর/বিরল/খানসামা/নবাবগঞ্জ/ঘোড়াঘাট উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ কাজ	১৫৫১.৮৮	
৫	জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর কোতয়ালী, ফুলবাড়ী, পার্বতীপুর থানা ভবন নির্মাণ প্রকল্প	৪৮৯.৯২	
৬	ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর জেলায় ৬টি ভূমি অফিস নির্মাণ।	২২৪.৩৩	
৭	কাহারোল উপজেলাধীন ঢেপা নদীর উপর ২৮০মি: পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ (কান্তজির মন্দির সংযোগ)	১৬৪৪.০০	এলজিইডি, দিনাজপুর
৮	সদর উপজেলাধীন মোহনপুর ব্রিজের নিকট আত্রাই নদীর ওপর ১৩৫মি. রাবার ড্যাম নির্মাণ	১৩০০.০০	
৯	সদর উপজেলাধীন ঢেপা নদীর ওপর ১৭৫মি. পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ (নশিপুর ব্রিজ)	১৩০০.০০	
১০	দিনাজপুর-বিরল-রাধিকাপুর (বিরল স্থলবন্দর) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	৭১১৪.৭৪	সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর
১১	দিনাজপুর-চিরিরবন্দর-পার্বতীপুর সড়ক প্রশস্তকরণ জেড-৫০২৫ প্রকল্প	৪৫২৭.৪০	
১২	তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পাধীন ২৮টি কলেজে ৪ তলা ভিতবিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ	৬৫৯৪.৮৪	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর
১৩	দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর প্রকল্পাধীন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ	১৩০৬.৭৪	
১৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর কাঞ্চন-পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটার গেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর	১০৬৪১৫.২৮	বাংলাদেশ রেলওয়ে, দিনাজপুর
১৫	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের দিনাজপুর ডিভিশনাধীন বগুড়া জেলা শহরে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য ১০-তলা আবাসিক ফ্ল্যাট ভবন নির্মাণ প্রকল্প কাজ	৬০০০.০০	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, দিনাজপুর
১৬	দিনাজপুর জেলা শহরে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ১০ তলা বিশিষ্ট ২টি আবাসিক ভবন ও ৫ তলা বিশিষ্ট ১টি বাণিজ্যিক ভবন	৫৫৬৫.০০	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, দিনাজপুর
১৭	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের দিনাজপুর ডিভিশনাধীন রংপুর জেলা শহরে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য ২টি ১০ তলা আবাসিক ফ্ল্যাট ভবন নির্মাণ প্রকল্প	৩০০০.০০	
১৮	করতোয়া নদীর ডান তীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২৫৫৪.৯১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর
১৯	সীমান্ত নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আত্রাই নদীর ডান তীর সংরক্ষণ	২৩৫০.০০	
২০	ক) ১১০ লক্ষ মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। খ) ১৩৫ লক্ষ মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৩৮৫৩.০০	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দিনাজপুর

এছাড়া ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন দপ্তর অনেকগুলো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে গণপূর্ত বিভাগ ৫৭.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ভবন, ৯.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর জেলা জজ কোর্ট ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুলহাট পুলিশ ফাঁড়ি ও আবাসিক ভবন, ৩.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মহিলা পুলিশ ব্যারাক, ২.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর জেলার পুলিশ লাইনে ৬ তলা ভিতবিশিষ্ট নারী ব্যারাক ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ, ৭.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর পুলিশ সুপার অফিস ভবন, ১.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বীরগঞ্জ এএসপি সার্কেল অফিস কাম-বাসভবন, ২.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কাহারোল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ২.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে চিরিরবন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ২.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিরল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ২.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে খানসামা উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ২.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নবাবগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ২.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ঘোড়াঘাট উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ৬.৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমিক ভবন, ৮.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সরকারি শিশু পরিবারের হোস্টেল নির্মাণ (৮-ইউনিট)' শীর্ষক প্রকল্পের অধীন দিনাজপুর রাজবাটি শিশু পরিবারের ১টি হোস্টেল নির্মাণ কাজসহ মোট ২৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তন্মধ্যে ৯টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্রুত

মোহনপুর রাবার ড্যাম

হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দিনাজপুর সড়ক বিভাগ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৭১.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর-বিরল-পাকুড়া-রাধিকাপুর (বিরল স্থলবন্দর) প্রকল্প এবং ৪৫.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর-চিরিরবন্দর-পাবর্তীপুর (সড়ক প্রশস্তকরণ) প্রকল্পসহ মোট ৩টি প্রকল্পের ৬২% কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে দিনাজপুরের সাথে পার্বতীপুর ও বিরল স্থলবন্দরের যোগাযোগ সহজ ও দ্রুততর হবে।

জেলা পরিষদ এ সময়ে ৩.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর জেলার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠের মিনার স্থানান্তরকরণ ও পুনঃনির্মাণ এবং ২০.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিরামপুর উপজেলার ঢাকা মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার ম্যুরাল নির্মাণসহ সর্বমোট ১০.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪১৫টি উন্নয়ন কাজের ৭৫% বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে।

৩০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুর-এর নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ইতোমধ্যে ৪৭% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ১০৬৪.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় এবং কাঞ্চন-বিরল মিটার গেজ সেকশনকে ডুয়েল গেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রড গেজে রূপান্তর প্রকল্পের শতভাগ কাজ সম্পন্ন করেছে, ইতোমধ্যে লাইনটি বাংলাদেশ-ভারত ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৮০.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৭৭টি প্রকল্পের ৫৮%, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর একই অর্থবছরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৮৩.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪টি প্রকল্পের ৮০% কাজ সম্পন্ন করেছে। অবিশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক- এর কার্যালয় '১.০৫ লক্ষ মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্যগুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৯.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি, চরকাই এলএসডিতে ৫০০ মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১টি, রানীগঞ্জ এলএসডিতে ৫০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি, মোট ৩টি গুদাম নির্মাণ কাজের ৭৫% সম্পন্ন করেছে।

এছাড়া স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ কাজসহ ২.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১টি উন্নয়ন প্রকল্পের ৯৪%, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি খাতে সার ও বীজ বিতরণ, রাবার ড্যাম নির্মাণ, বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনসহ ১১টি প্রকল্পের ৮১.৮৫%, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ৮.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে জেলার ১৩টি উপজেলার বিদ্যালয় মেরামত-ওয়াশব্লক-বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পের ৮৫%, জেলা শিক্ষা অফিস ১৮৫.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের শতভাগ, জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ৩.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিরল, হাকিমপুর ও বীরগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস নির্মাণ কাজের ৯৫%, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ৩.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২

৮ই এপ্রিল ২০১৭, বিরল ও রাধিকাপুরের মধ্যে নবনির্মিত রেলপথে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়

প্রকল্পের শতভাগ, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের শতভাগ, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১০২২ কোটি টাকা ব্যয়ে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শতভাগ, জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৯.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি প্রকল্পের ৮৫% কাজ সম্পন্ন করেছে।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, দিনাজপুর অফিসের আওতায় ৫৫.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জেলা শহরে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ৬০%, ১০.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় সীমিত আয়ের লোকদের জন্য সাইট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্লট উন্নয়ন প্রকল্পের ৬০% এবং ৫০.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে বগুড়া হাউজিং এস্টেটে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর অফিস জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলাধীন দল্লা

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, দিনাজপুর

(গড়গড়া) নামক স্থানে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কাঁকড়া নদীর ডান তীর ৩৮৫ মি. প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৫০%, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন মালঝাড় চকচকা নামক স্থানে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢেপা নদীর ডান তীর ১৮৫.০০ মি. সংরক্ষণ কাজের ৫০% এবং একই প্রকল্পের আওতায় বীরগঞ্জ উপজেলাধীন সাদুল্লাপাড়া নামক স্থানে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢেপা নদীর বাম তীর ৩২৫ মি. তীর সংরক্ষণ কাজের ৪০% সম্পন্ন করেছে।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের শতভাগ এবং সামাজিক বন বিভাগ ৩.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ইকো রিস্টোরেশন অব দ্য নর্দান রিজিয়ন অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের শতভাগ সম্পন্ন করেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে ২১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম এবং স্থানীয় উদ্যোগে ৩৮৮ প্রাথমিক বিদ্যালয় মিড-ডে মিল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় ৩৮.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচির শতভাগ, ৩৩.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮৬৫টি টিআর কর্মসূচির শতভাগ, ২৫.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭০০টি কাবিটা কর্মসূচির শতভাগ এবং ৩৬.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪৩০টি ইজিপিপি কর্মসূচির ৯৮% বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে।

জেলা তথ্য অফিস বর্তমান সরকারের সাড়ে ৮ বছরে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় বাল্যবিবাহ, মাদক প্রতিরোধ, যৌতুক নিরোধ, শিশু ও নারী পাচার রোধ, ইভটিজিং, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সবার জন্য নিরাপদ পানি, সবার জন্য বিদ্যুৎ ইত্যাদি ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নানারকম প্রচার কৌশলে ২৯টি আলোচনা সভা ও মতবিনিময় সভা, ৩০টি মহিলা সমাবেশ, ২১০২টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ৩৫৯টি সংগীতানুষ্ঠান, ৩০টি র‍্যালি, ১১৩টি উঠান

গোর-এ-শহীদ বড়ো ময়দানে ঈদ জামাতের নবনির্মিত মিনার

বৈঠক ও কমিউনিটি সভা, ৪৫টি প্রেস ব্রিফিং, ১০৮৩টি পথ প্রচার, ১১১৯টি কথামালা প্রচার, ১৫টি ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, ১১১৩টি ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশ, ৫টি রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন ও বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া ৪,২৮,২০০ কপি পোস্টার স্থাপন ও বিতরণ, ২২,৬৪২ কপি নবারুণ ও সচিত্র বাংলাদেশ পুস্তিকা বিতরণ এবং ২৫২ বার সিনেমা হল পরিদর্শন করা হয়েছে।

এছাড়া স্বাস্থ্য ও সামাজিক ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অফিস, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, সিভিল সার্জন অফিসের স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে।

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ

ক) উপমহাদেশের বৃহত্তম ঈদগাহ মিনার নির্মাণ

দিনাজপুর জেলা শহরের ঐতিহাসিক গোর-এ-শহীদ বড়ো ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে নির্মাণ করা হয়েছে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড়ো ঈদগাহ মাঠ ও মিনার। ৫২ গম্বুজের এই ঈদগাহ মিনার ও মিনার সংলগ্ন মাঠে একসঙ্গে পাঁচ লক্ষাধিক মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবে। এই ঈদগাহ মিনার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা। ২০১৫ সালে জেলা পরিষদ এই ঈদগাহের নির্মাণকাজ শুরু করে। ভারতের ঐতিহাসিক কুতুব মিনারের আদলে নির্মিত ৫২ গম্বুজবিশিষ্ট স্থাপনাটির

সীতাকোট বিহার, নবাবগঞ্জ

দৈর্ঘ্য ৫১৬ ফুট। এর দুই পাশের দুটি মিনার, মাঝের দুটি মিনার ও প্রধান মিনারের উচ্চতা যথাক্রমে ৬০ ফুট, ৫০ ফুট ও ৫৫ ফুট। এর মেহরাবের উচ্চতা ৫০ ফুট এবং দুটি গেটের উচ্চতা ৩০ ফুট। এছাড়া ৫২টি গম্বুজ ২০ ফুট উচ্চতায় স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭ সালের জুন মাসে এই ঈদগাহের নির্মাণ সম্পন্ন হয়। সৌন্দর্য বাড়াতে গম্বুজগুলোতে মার্বেল পাথর ও রং-বেরঙের বৈদ্যুতিক বাতি সংযোজন করা হয়েছে। রাতের বেলা মিনারটির অপরূপ দৃশ্য ও নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী স্থানীয় জনসাধারণ ও পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে ঐতিহ্যবাহী স্টেশন ক্লাব অন্য প্রান্তে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। মাঠ সংস্কার করে ইতোমধ্যে ঘাস লাগানো হয়েছে। সংস্কারের পর ২০১৭ সালের ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে এই ঈদগাহ মাঠের উদ্‌বোধন করা হয়। ক্রমান্বয়ে দেশের সবচেয়ে বড়ো ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে এ মাঠে। দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপনাটি দেখতে প্রতিদিন প্রচুর পর্যটকের সমাগম হয়।

খ) কালেক্টরেট মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি সংস্কার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে কালেক্টরেট মিউজিয়ামটি সম্প্রতি সংস্কার করে সেখানে অত্যাধুনিক আইটি কক্ষ, কালেক্টরেট লাইব্রেরি ও কালেক্টরেট মিউজিয়াম করা হয়েছে।

দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী স্থান ও পর্যটন কেন্দ্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত দিনাজপুরের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এ জেলায় প্রাচীন ও আধুনিক বহু পর্যটন কেন্দ্র অবস্থিত।

রামসাগর

দিনাজপুর শহরের কেন্দ্র থেকে ৮ কিমি. দক্ষিণে আউলিয়াপুর ইউনিয়নে অবস্থিত দিনাজপুরের মহারাজদের অন্যতম কীর্তি রামসাগর দিঘি। এর চারদিকে সবুজ প্রান্তর। ছোটো ছোটো ধূসর মাটির টিলা দ্বারা বেষ্টিত সাগরের মতো এ দিঘির পাড়ভূমিসহ মোট আয়তন ৪,৩৭,৪৯২ বর্গমিটার। জলভাগের দৈর্ঘ্য ১০৩১ মিটার, প্রস্থ ৩৬৪ মিটার। গভীরতা গড়ে প্রায় ৯ মিটার। সর্বোচ্চ পাড়ের উচ্চতা প্রায় ১৩৫০ মিটার। সেচ সুবিধা, প্রজাদের সুপেয় পানির কষ্ট দূরীকরণ এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের কাজের বিনিময়ে খাদ্যের সংস্থান হিসেবেই রাজা রামনাথের আমলে এ দিঘি খনন করা হয়। তার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। দিঘির পাড়ের উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত মনোরম বাংলোটি দেশি-বিদেশি অসংখ্য পর্যটকের কাছে স্বপ্নিল আকর্ষণ।

সীতাকোট বিহার

সীতাকোট বিহার দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত একটি বৌদ্ধ বিহার। এই স্থাপত্যটি আয়তনে প্রায় বর্গাকৃতির। এটি পূর্ব-পশ্চিমে ৬৫২৩ মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬৪১১ মি. দীর্ঘ। বিহারটিতে ৪১টি কক্ষ ছিল, কক্ষগুলো ছিল প্রায় ৩৬৬মি.×৩৩৫মি. আকৃতির সম আয়তনের। বিহারের পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রীয় কক্ষত্রয় অন্যান্য সাধারণ কক্ষের তুলনায় আয়তনে বড়ো ছিল। প্রতিটি কেন্দ্রীয় কক্ষের একটি করে ইটের বেদি ছিল। সেখানে পূজার মূর্তি রাখা হতো। খুব সম্ভবত দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রীয় কক্ষটি ছিল প্রধান মন্দির।

জেলা সার্ভার স্টেশন, দিনাজপুর

কান্তজিউ মন্দির, কান্তনগর, কাহারোল

কান্তজিউ মন্দির

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে এবং দিনাজপুর-তেঁতুলিয়া সড়কের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে ঢেপা নদীর পাড়ে এক শান্ত নিভৃতগ্রাম কান্তনগরে এ মন্দিরটি স্থাপিত। কান্তনগর মন্দির ইটের তৈরি অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি নবরত্ন মন্দির। বাংলার স্থাপত্যসমূহের মধ্যে বিখ্যাত এ মন্দিরটির বিশিষ্টতার অন্যতম কারণ হচ্ছে পৌরাণিক কাহিনিসমূহ পোড়ামাটির অলংকরণে দেয়ালের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন রয়েছে এ মন্দিরে।

মহারাজ প্রাণনাথ ১৭২২ সালে এ মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং ১৭৫২ সালে মন্দিরটির নির্মাণ সম্পন্ন করেন। এ জমকালো পিরামিড আকৃতির মন্দিরটি তিনটি ধাপে উপরে উঠে গিয়েছে এবং তিন ধাপের কোণগুলোর উপরে মোট নয়টি অলংকৃত শিখর বা রত্ন রয়েছে যা দেখে মনে হয় যেন একটি উঁচু ভিত্তির উপর প্রকাণ্ড অলংকৃত রথ দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের চারদিকে খোলা খিলান পথ রয়েছে যাতে যে-কোনো দিক থেকেই পূজারিরা ভেতরের পবিত্র স্থানে রাখা দেবমূর্তিকে দেখতে পায়। পাথরের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো মন্দিরটির উচ্চতা ৫০ ফুটেরও বেশি।

সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরটি সংস্কার করেছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য মন্দির এলাকায় রেস্টহাউজ, পর্যটন কর্পোরেশনের রেঁস্তোরা, স্থায়ী মার্কেট ও বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গড়েয়া বাজারে ঢেপা নদীর ওপর একটি ২৮০মি. দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করে এই বাইপাস সড়ককে দিনাজপুর-পঞ্চগড় সড়কের সাথে সংযুক্ত করেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড এই মন্দির রক্ষায় ঢেপা নদীর ডান তীর সংরক্ষণের কাজ শুরু করেছে।

রাজবাড়ি

দিনাজপুর রাজবাড়ি দিনাজপুর শহরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি নিদর্শন মাত্র। আদিতে প্রতিরক্ষা পরিখা ও উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত দিনাজপুর রাজবাড়ির বর্তমান পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপে প্রবেশের জন্য পশ্চিমদিকে একটি উঁচু খিলানপথ রয়েছে। প্রবেশ পথের বামদিকে মূল প্রাসাদ এলাকার মধ্যে খোলা জায়গায় রয়েছে একটি কৃষ্ণ মন্দির। ডানদিকে রয়েছে প্রাসাদের বহির্বাটির কিছু ধ্বংসাবশেষ ও অপর একটি প্রবেশ পথ। বর্গাকার চত্বরটির পূর্বপার্শ্বে রয়েছে চত্বরমুখী সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি মন্দির।

পূর্ব ও দক্ষিণের দুটি বৃহৎ দিঘি, পরিখা, বাগান, একটি বিলুপ্ত চিড়িয়াখানা, একটি টেনিস কোর্ট, কাচারি ও কুমার হাউসসহ রাজবাড়িটি প্রায় ১৬৪১ একর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। মূল মহল ও এর সংলগ্ন পরিখা সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা প্রাণনাথ ও তাঁর পোষ্যপুত্র রামনাথ নির্মাণ করেছিলেন।

চেহেলগাজী মসজিদ ও মাজার

চেহেলগাজী মসজিদ ও মাজার দিনাজপুর জেলার সদর থানার চেহেলগাজী গ্রামে অবস্থিত। দিনাজপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ৭ কিমি. উত্তরে পাকা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদটির অবস্থান। চেহেলগাজী মাজারটি মসজিদ সংলগ্ন। রাজা গোপালের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে ৪০ জন মুসলিম দরবেশ নিহত হন। নিহত হলেও ভক্তগণ তাঁদের গাজীর সম্মানে স্মরণ করে ৫৪ ফুট দীর্ঘ সমাধিস্থলটি নির্মাণ করে। ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দে চেহেলগাজীর মাজারে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, ৮৬৫ হিজরির ১৬ সফর (১৪৬০খ্রি. ১লা ডিসেম্বর) মসজিদটি নির্মাণ ও মাজারটি সংস্কার করা হয়। বুকানন হ্যামিল্টনের প্রতিবেদনে প্রথম চেহেলগাজী মাজার সম্পর্কে জানা যায়। মাজারের প্রবেশ পথের বামদিকে রয়েছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ১৩৫ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার কবর।

ঘোড়াঘাট দুর্গ

ঘোড়াঘাট দুর্গের মসজিদ দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে করতোয়া নদীর ডান তীরে অবস্থিত। দুর্গ এলাকার অভ্যন্তরে অনেকগুলো ধর্মীয় ও ঐতিহ্যিক ইমারত নির্মিত হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় মসজিদটি এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঢিবি টিকে আছে। শিলালিপি অনুসারে ঘোড়াঘাট সরকারের জনৈক মুঘল ফৌজদার জয়নাল আবেদীন ১৭৪০-৪১ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন। অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বিশালাকৃতির দুটি ফাঁপা অষ্টকোণাকার বুরুজ ছিল, যার ভিত্তি এখনো টিকে আছে। এ বাঁধানো অঙ্গনের দক্ষিণে একটু দূরে রয়েছে বড়ো একটি পাথরের কূপ, যা সম্ভবত নির্মিত হয়েছিল অজুর উদ্দেশ্যে।

১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে দুর্গের অভ্যন্তরে একটি ঢিবি খনন করতে গিয়ে আরেকটি মসজিদ আবিষ্কৃত হয়েছে। উপরিউক্ত মসজিদটি থেকে প্রায় ২০০ গজ পশ্চিমে দুর্গের পশ্চিমদিকের বেষ্টনী প্রাচীর ঘেঁষে এর অবস্থান। খননের ফলে মসজিদটি অংশিক উন্মোচিত হয়েছে।

নয়াবাদ মসজিদ

নয়াবাদ মসজিদ দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের নয়াবাদ গ্রামে অবস্থিত। জেলা সদর থেকে ২০ কিমি. উত্তর-পশ্চিমে ঢেপা নদীর পশ্চিম তীরে এর অবস্থান। ১১৫ বিঘা জমির ওপর মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি আয়তাকার। বাইরের দিক থেকে মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১২৪৫ মিটার এবং প্রস্থ ৫৫ মিটার। দেয়ালের প্রশস্ততা ১১০ মিটার।

বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক মসজিদটি সংস্কার করা হয়েছে। মসজিদের সামনে নতুন করে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। মসজিদের প্রবেশদ্বারের উপর ফারসি ভাষায় রচিত লিপি থেকে জানা যায়, সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময় ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২০০ বাংলা সনে (১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

চেহেলগাজী মাজারের প্রবেশদ্বার ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ

সুরা মসজিদ, ঘোড়াঘাট

সুরা মসজিদ

ঘোড়াঘাট উপজেলার সুরায় এটি অবস্থিত। ঘোড়াঘাট ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং একই দিকে ঘোড়াঘাট উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে ইট ও পাথরে নির্মিত মসজিদটির অবস্থান। এর চারপাশে ছড়িয়ে আছে বেশ কিছুসংখ্যক প্রস্তরফলক। কিছু কিছু প্রস্তরফলকে ছোটো সোনা মসজিদে ব্যবহৃত নমুনার প্যানেল ও অন্যান্য ডিজাইন রয়েছে। এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার এই মসজিদটিকে বাইরের শব্দ ও কোলাহল থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বেষ্টনী-প্রাচীরগুলো যথেষ্ট উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছিল। বাংলার আর কোনো মসজিদে এমন কৌশল আগে কখনো দেখা যায়নি।

নির্মাণশৈলীর ভিত্তিতে আহমদ হাসান দানী মসজিদটিকে হোসেন শাহ আমলের বলে মনে করেন। সম্প্রতি এ স্থান থেকে কয়েক মাইল দূরে চম্পাতলী নামক স্থানে আবিষ্কৃত আলাউদ্দীন হোসেন শাহ- এর আমলের একটি শিলালিপিতে ৯১০ হিজরি (১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দ) উল্লেখ আছে। এতে একটি মসজিদ নির্মাণেরও উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে মসজিদটির নির্মাণকাল ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দ বলে ধারণা করা হয়।

স্বপ্নপুরী

স্বপ্নপুরী আসলেই স্বপ্নপুরী। এটি আধুনিক স্থাপত্যের সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশের সর্ববৃহৎ এমিউজমেন্ট পার্ক। এটির মূল গেটে দুটি পরি আকাশের দিকে হাত তুলে আলোকবর্তিকা নিয়ে অভ্যাগতদের স্বাগত জানায়। নবাবগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিমি. উত্তরদিকে ৯নং কুশদহ ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে খালিকপুর মৌজায় অবস্থিত। স্থানীয় ব্যবসায়ী জনাব মো. দেলওয়ার হোসেন অক্লান্ত শ্রম ও অর্থের বিনিময়ে ১৯৮৯ সালে এ স্বপ্নপুরী নির্মাণের কাজ শুরু করেন। রোপওয়ে, ক্যাবলকার, ঘোড়ার গাড়ি, চিড়িয়াখানা, কৃত্রিম চিড়িয়াখানা, কৃত্রিম মৎস্য জগৎ, রেস্টুরেন্টসহ বিভিন্ন বিনোদন সুবিধার পাশাপাশি স্বপ্নপুরীতে ১০টি ভিআইপি রেস্টহাউস, ১৪টি মধ্যম শ্রেণির ও ৮টি অন্যান্য রেস্টহাউস রয়েছে। বর্তমানে আরো রেস্টহাউস নির্মাণসহ স্বপ্নপুরীর উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। সারাবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পর্যটক স্বপ্নপুরী বেড়াতে আসে।

ফুলবাড়ি দুর্গ

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার কাটাবাড়ি মৌজায় ফুলবাড়ি দুর্গ অবস্থিত। ১৮৫৯-এর রেভিনিউ সার্ভে মানচিত্রে এ দুর্গের নাম 'গড় গোবিন্দ' লেখা আছে। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, এটি গড় গোবিন্দ বা কানা রাজার গড়। লালমাটিতে গঠিত এই দুর্গের প্রাচীরগুলো প্রায় ২ মিটার প্রশস্ত এবং উচ্চতা ছিল প্রায় ৪ মিটার। এটি যে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের একটি নিদর্শন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রাচীন নগরী কুন্দারনপুর

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার চোরগাছা সংলগ্ন গ্রাম কুন্দারনপুর। এ গ্রামে ৯টি প্রাচীন দিঘি আছে। আরো আছে যত্রতত্র প্রাচীন ইটের টুকরোর ছড়াছড়ি। এ গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী চোপাগাড়ী ও ছয়ঘট্টি পাঠগাঁওতে আছে যথাক্রমে ৩টি ও ৭টি প্রাচীন দিঘি। এখানকার প্রাচীন নগরীটি সম্ভবত গুপ্তযুগের অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার বলে ধারণা করা হয়। সম্ভবত কুন্দারনপুর ছিল গ্রিক ইতিহাসে বর্ণিত পেন্টাপলিস বা পঞ্চনগরীর একটি।

হরিনাথপুর দুর্গনগরী

দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ১০ কিমি. দক্ষিণ-পূর্বে শালবনের ভেতরে এই দুর্গনগরী অবস্থিত। প্রাচীন দুর্গনগরীর স্থলে এখানে গড়ে উঠেছে হরিনাথপুর রাজার নামে বিদ্যালয়। স্থানটি বর্তমানে সমতল এবং চাষাবাদের জমিতে পরিণত হয়েছে। তবে এখনো এখানকার মাটিতে প্রাচীনকালের ইট পাওয়া যায়। দুর্গনগরীর পরিখার অস্তিত্ব এখনো পরিদৃষ্ট হয়।

প্রাচীন বেলওয়া নগরী

দিনাজপুর জেলার রাণীগঞ্জ বাজারের কাছেই বেলওয়া'র অবস্থান। বেলওয়া ঘোড়াঘাট উপজেলার অন্তর্গত। এখানে সম্ভবত গুপ্ত যুগে এমনকি তারও আগে একটি বড়ো শহর ছিল। এখান থেকে পাল যুগের দুটি তাম্রলেখ পাওয়া গেছে, যার একটি প্রথম মহিপালের ও অন্যটি তৃতীয় বিগ্রহ পালের।

বারো পাইকের গড়

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা থেকে ৫ কিমি. উত্তরে এবং বেলওয়া থেকে ৪ কিমি. পূর্বে মইলা নদীর তীরে প্রাচীন এ দুর্গ অবস্থিত। ঐতিহাসিকদের মতে, কামরূপের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাল আমলে এ দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল ।

সাহিত্য-সংস্কৃতি

দিনাজপুর জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চার দিক দিয়ে পূর্ব থেকেই সমৃদ্ধ। দিনাজপুরের সংস্কৃতিমনা লোকজন বিভিন্ন সময়ে তাদের এই অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করার জন্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, গোষ্ঠী, দল গঠন করেছে। বাংলাদেশে প্রথম নাট্য সংগঠন গড়ে উঠে দিনাজপুরে। দিনাজপুর নাট্য সমিতি গঠিত হয় ১৯১৫ সালে। এ জেলার নবরূপী, ভৈরবী ও আমাদের থিয়েটার জেলার সীমানা ছাড়িয়ে দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। জেলা শহর ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলায় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দল গড়ে উঠেছে।

পূর্ব থেকেই দিনাজপুরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করছে। দিনাজপুর শহরের সুইহারীতে প্রায় এক একর জমির ওপর ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি। বর্তমানে কালচারাল একাডেমিতে সাঁওতাল, ওঁরাও, মালো, মাল পাহাড়ি, পাহালি, পালমাকার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যগণ তাদের সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পালন করে থাকে। ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ সালে এ একাডেমি থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রায় ৬০০ জন সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক দল সাফ গেমস-এ অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া শিশু একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, সংগীত মহাবিদ্যালয়, লোক ভবন, দিনাজপুর মিউজিয়াম ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এ জেলার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

দিনাজপুর রাজবাড়ি

নয়াবাদ মসজিদ, কাহারোল

মেলা-পার্বণ

প্রাচীনকাল থেকে দিনাজপুর জেলা মেলার দেশ বলে সর্বজনবিদিত। বিভাগপূর্ব যুগের ধলদিঘি, চিন্তামন, জোয়ার, কুকুরামনি, আলোয়া খাওয়া, ঢেমঢেমি কালির মেলা, নেকমন্দ পীরের মেলা প্রভৃতি এ যুগেও সুপ্রসিদ্ধ ও আন্তর্দেশিক খ্যাতিসম্পন্ন মেলা। ঐ সময় গ্রাম্য মেলাতে উন্নত জাতের গবাদি পশু, হাতি, ঘোড়া, উট, দুম্বার কেনাবেচার (প্রদর্শনী নয়) ব্যবস্থা ও যাত্রা-থিয়েটার, সার্কাসের মাধ্যমে লোক বিনোদনের সমারোহপূর্ণ আয়োজন থাকত। একালেও তা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে দিনাজপুরের অন্যতম প্রধান লোকজ মেলা হলো ফুলবাড়ি উপজেলার চিন্তামন পশু মেলা, কাহারোল উপজেলার কান্তজিউ মন্দির প্রাঙ্গণের রাশমেলা, বীরগঞ্জ উপজেলার কালি মেলা, সদর উপজেলার চেরাডাংগী মেলা ইত্যাদি।

লোকজ উৎসব

দিনাজপুরে মুসলমানদের মহররম উৎসব ও হিন্দুদের দীপাবলি উৎসব উভয় সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় বিনোদন তথা লোকোৎসব। মহররমের দশম দিনে লাঠিখেলা, তাজিয়া, মিছিল, মহররম মেলা ও মাতমজারি প্রভৃতি শোকানুষ্ঠানের মাধ্যমে মহররম উদ্‌যাপিত হয়। পক্ষান্তরে দুর্গাপূজা ও কালিপূজার সময় গান-বাজনা, নাচ প্রভৃতি শিল্প ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক'দিনের কর্মসূচি খুব জাকজমক করে উদ্‌যাপিত হয়। শহরের নিমনগর মহল্লায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ধর্মীয় লোকোৎসব উদ্‌যাপনের প্রচলন এখনো রয়েছে। উক্ত উৎসবকে 'মাইবোঙ্গার' উৎসব বলে। মাইবোঙ্গা সাঁওতালদের নারী দেবী।

পত্রপত্রিকা

দিনাজপুর জেলা থেকে ১৪টি দৈনিক পত্রিকা এবং ৯টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহ হলো- দৈনিক তিস্তা, দৈনিক উত্তর বাংলা, দৈনিক আজকের দেশবার্তা, দৈনিক পত্রালাপ, দৈনিক জনমত, দৈনিক আজকের প্রতিভা, দৈনিক মানব বার্তা, দৈনিক প্রতিদিন, দৈনিক অন্তর কণ্ঠ, দৈনিক উত্তরা, দৈনিক কাঞ্চন, দৈনিক পল্লী বার্তা, দৈনিক স্বর্ণ সকাল ও দৈনিক খবর একদিন। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো হলো: সাপ্তাহিক ফলো আপ, সাপ্তাহিক দিগন্ত বার্তা, সাপ্তাহিক গাজী, সাপ্তাহিক জিরো পয়েন্ট, সাপ্তাহিক দেশ মা, সাপ্তাহিক অতঃপর, সাপ্তাহিক আওয়ামী কণ্ঠ, সাপ্তাহিক আজকের দিনাজপুর ও সাপ্তাহিক উত্তর কণ্ঠ। তন্মধ্যে দৈনিক মানব বার্তা পার্বতীপুর থেকে এবং সাপ্তাহিক দেশ মা ফুলবাড়ি উপজেলা থেকে প্রকাশিত হয়। এ জেলা থেকে বেশ কয়েকটি অনলাইন পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এছাড়া এ জেলায় দেশের প্রায় সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যুরো অফিস রয়েছে।

দিনাজপুর জেলার মেলা ও পার্বণ

মেলার নাম	অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান	সম্ভাব্য সময়
রামলীলা বারণী মেলা	সকল উপজেলা	এপ্রিল
শামুক শাহ জিন্দাপীর মেলা	বীরগঞ্জ উপজেলা	এপ্রিল
তালুকদার পশু মেলা	চিরিরবন্দর উপজেলা	এপ্রিল
ভবানীপুর কলেজ মেলা	পাবর্তীপুর উপজেলা	জানুয়ারি
বড়পুকুরিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ মেলা	পাবর্তীপুর উপজেলা	এপ্রিল
শহীদ স্মৃতি আদর্শ মেলা	ফুলবাড়ি উপজেলা	জানুয়ারি
ফাসিলা ডাঙ্গা পশু মেলা	দিনাজপুর সদর	জানুয়ারি
মাদিলাহাট পশু মেলা	ফুলবাড়ি উপজেলা	জানুয়ারি
উথরাইল গোয়াল হাট মেলা	দিনাজপুর সদর	জানুয়ারি
পার্বতীপুর ডিগ্রি কলেজ মেলা	পার্বতীপুর উপজেলা	ডিসেম্বর
কাটলা পশু মেলা	বিরামপুর উপজেলা	জানুয়ারি
বারণী মেলা	সকল উপজেলা	এপ্রিল
বুড়াখাঁ পিরের মেলা	খানসামা উপজেলা	মার্চ
মিনা বাজার	সকল উপজেলা	মার্চ
আনন্দ মেলা/ বিবিধ মেলা	সকল উপজেলা	ফেব্রুয়ারি
গোপালপুর চৌধুরী মেলা	ঘোড়াঘাট উপজেলা	জানুয়ারি
চ্যারিটি শো	সকল উপজেলা	বারো মাস
বাজনাহার ধুকুরঝাড়ী মেলা	বিরল	মার্চ
দিঘন কালির মেলা	দিনাজপুর সদর	নভেম্বর
যাত্রা/ সার্কাস	সকল উপজেলা	বারো মাস
বিভিন্ন ধর্মীয় মেলা/বিবিধ মেলা	সকল উপজেলা	অক্টোবর
ঢেমঢেমিয়া কালির মেলা	বীরগঞ্জ উপজেলা	অক্টোবর
পীরগঞ্জ পশু মেলা	চিরিরবন্দর উপজেলা	নভেম্বর
চেরাডাংগী মেলা	দিনাজপুর সদর	ফেব্রুয়ারি
কান্তনগর রাস মেলা	কাহারোল উপজেলা	নভেম্বর
শিল্প ও বাণিজ্য মেলা	দিনাজপুর সদর	ডিসেম্বর
বৈশাখি মেলা	দিনাজপুর সদর	এপ্রিল
মুরাদপুর মেলা	দিনাজপুর সদর	এপ্রিল
বিজয় মেলা	সকল উপজেলা	ডিসেম্বর

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন, সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ

খেলাধুলা

বিভিন্ন ঋতুতে জনপ্রিয় খেলাসমূহ হলো- ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ভলিবল, সাঁতার, জিমন্যাস্টিকস, ভারত্তোলন, মুষ্টিযুদ্ধ, ব্যাডমিন্টন, শরীর গঠন (বডি বিল্ডিং), টেবিল টেনিস, হ্যান্ডবল, হকি, জুডো কারাত, শুটিং, সাইক্লিং, অ্যাথলেটিকস, খো খো, আরচারি (তীর নিক্ষেপ) ইত্যাদি। দিনাজপুর স্টেডিয়াম, দিনাজপুর বড়ো ময়দান, দিনাজপুর মহারাজা স্কুল, দিনাজপুর একাডেমি স্কুল মাঠ এবং তফিউদ্দিন স্কুল মাঠ মূলত খেলাধুলা চর্চার প্রধান স্থান। বর্তমান সরকারের সময় দিনাজপুর স্টেডিয়াম সংস্কার এবং বড়ো মাঠে স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও পৌর পার্কে স্কেটিং ট্র্যাক নির্মাণ করা হয়েছে। দিনাজপুর থেকে লিটন দাস জাতীয় ক্রিকেট টিমে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। স্কেটিং-এ একাধিক স্বর্ণ পদকলাভ করেছেন দিনাজপুরের নবীন খেলোয়াড়গণ। মরিচা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে ফুটবল খেলোয়াড়রা 'বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ২০১৫' প্রতিযোগিতায় জাতীয় রানার আপ হয়েছে। খেলাধুলার বিকাশে আরো যেসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে:

ক) রোলার স্কেটিং ট্র্যাক নির্মাণ

দিনাজপুর জেলার কিশোর, যুবক ও তরুণদের রোলার স্কেটিং আগ্রহের বিষয়টি লক্ষ রেখে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে স্থানীয় তহবিল থেকে প্রায় ৭ (সাত) লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে অত্যাধুনিক একটি রোলার স্কেটিং গ্রাউন্ড, যেখানে দিনাজপুরের কিশোর-যুবকরা নিয়মিত স্কেটিং অনুশীলন করে থাকে। এবছর দিনাজপুর দল জাতীয় রোলবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

খ) জিমনেশিয়াম সংস্কার

জেলা প্রশাসকের কার্যকরী উদ্যোগে ১৯৮৪ সালে নির্মিত 'দিনাজপুর জিমনেশিয়াম' কে সংস্কার করে অত্যাধুনিক রূপ দেওয়া হয়েছে। এ জিমনেশিয়ামে ইতোমধ্যে ৪টি ইনডোর ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ) স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণ

দিনাজপুর গোর-এ-শহীদ বড়ো মাঠের উত্তর প্রান্তে খেলোয়াড়দের বিশ্রাম ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন্য স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণ করা হয়েছে।

ঘ) স্টেশন ক্লাব / মহিলা ক্লাব / টেনিস কমপ্লেক্স

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্টেশন ক্লাবটি স্বাধীনতার পর জেলা প্রশাসকগণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উত্তরবঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে পরিণত হয়েছে। ক্লাব প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে দু'টি টেনিস কোর্ট, রয়েছে একটি বিশাল একতলা টেনিস ক্লাব। এর সাথে যুক্ত হয়েছে একটি কমিউনিটি সেন্টার। স্টেশন ক্লাবের সহযোগী সংগঠন হিসেবে মহিলা ক্লাব পরিচালিত হচ্ছে। নবনির্মিত গোর-এ-শহীদ ঈদগাহ'র কারণে স্টেশন ক্লাবটি মাঠের মধ্যস্থল থেকে একপাশে সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম চলমান আছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, দিনাজপুর জেলায় বর্তমান সরকারের সময়ে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ও কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশনসহ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম এবং উন্নয়নের ধারা অব্যহত থাকলে দিনাজপুর জেলা অচিরেই জাতীয় অর্থনীতিতে আরো ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

লেখক: জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর

ফটোফিচার: মো. নাজিমউদ্দিন, মো. রাহিনুর ইসলাম, ও মো. ফরিদ হোসেন

প্রবন্ধ

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

বরুণ দাস

দুর্যোগ বা Disaster হচ্ছে প্রকৃতি বা মনুষ্যসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট কোনো ঘটনা, যার ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সম্পদ-সম্পত্তি ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন অথবা ভোগান্তির সৃষ্টি করে, যা মোকাবিলায় ঐ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি যা মোকাবিলার জন্য ত্রাণ এবং বাইরের যে-কোনো প্রকারের সহায়তার প্রয়োজন হয়। যেমন– বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, সুনামি, ভূমিকম্প, খরা, অগ্নিকাণ্ড, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা এবং সম্প্রতি বাংলাদেশে আগত লাখ লাখ রোহিঙ্গা।

প্রশমন হচ্ছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বা পদক্ষেপসমূহ যা কোনো বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাজনিত ফলাফলকে হ্রাস করতে বা কমাতে পারে। দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রশমন তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়, যার কারণে দুর্যোগ, বিপর্যয় বা ঝুঁকি অনেকটা কমিয়ে ফেলা সম্ভব।

দুর্যোগ মূলত দুই রকম। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে আজ নানারকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ভূমিকম্প, খরা এসব যেন এখন নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতির এসব তাণ্ডব ঠেকানো মানুষের জন্য বেশ দুরূহ ব্যাপার। তাই এসব প্রতিরোধে মূল কাজটি হচ্ছে দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তীতে এমন কার্যক্রম হাতে নেওয়া যা প্রাণ ও সম্পদহানি হ্রাস করতে পারে। এই সামগ্রিক কার্যক্রমকে বলা হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৮৯ সালের ৪৪তম অধিবেশনে ১৯৯০ থেকে ২০০০ দশককে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন দশক ঘোষণা করে। এছাড়া প্রতিবছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বুধবার পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'। দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দুর্যোগ নিরাপত্তার জন্য সব পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা।

বিশ্বের সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এক্ষেত্রে বিশ্বের ১৭৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। ঝুঁকির দিক থেকে প্রথম এবং বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগে মানবসম্পদ ক্ষতির দিক থেকে ষষ্ঠ। 'ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন'-এর ২০১১ সালের বৈশ্বিক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়, বন্যা, সুনামি ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সূচকে বিশ্বের মোট ১৬২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য বড়ো ঝুঁকির কারণ। প্রতিবছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৩০ শতাংশ মানুষ। আর বেশি বন্যা হলে ৭০ শতাংশ মানুষ ক্ষতির শিকার হয়। গত ৫৫ বছরে ১৮টি বড়ো ধরনের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশ উপকূলীয় এলাকার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এর মধ্যে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে অন্তত ৩ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়টি ছিল সিডর। ২০০৭ সালে এটি উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে। গত এক দশকে নদীর ভাঙনও বেড়েছে। প্রতিবছর এক হাজার থেকে আড়াই হাজার একর ভূমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বাংলাদেশে ইদানীং ঘন ঘন ভূমিকম্পও অনুভূত হয়। ঝুঁকি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মধুপুরের চ্যুতিতে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হলে রাজধানী ঢাকার অন্তত বাহাত্তর হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা মেরামত করা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশ গত দশ বছরে দুর্যোগ প্রশমনে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ সরকারের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে দাতা সংস্থাগুলো ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' শীর্ষক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ ও ত্রাণ বণ্টনের পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় সমন্বিত ও টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যাতে ঝুঁকিতে পড়া মানুষগুলোর বিপদ মোকাবিলা করার দক্ষতা তৈরি হয়। 'সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প'-এর প্রথম পর্যায়ে (২০০৪-২০০৯) দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের প্রক্রিয়া এবং কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেওয়ার জন্য কাজ করেছে। বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রচেষ্টায় নির্দেশনার জন্য ২০০৫-২০১৫ সাল পর্যন্ত 'হিয়োগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন'-এর প্রতি জোর দিয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে উপকূলীয় বনায়নের কার্যকারিতা অনুধাবন করে ১২,৩০,০০০ একর জমিতে বনায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এ পর্যন্ত দুই লাখ একর জমিতে বনায়ন করেছে। এর মধ্যে এক লাখ একর জমির গাছপালাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপকূলীয় এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সব বাঁধে গাছ লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের সঙ্গে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। সর্বোচ্চ ফোরাম হিসেবে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিষদ। ২০২১ সালের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল, নীতি, পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রকল্পকে মূলধারায় আনতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) এবং জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে চলেছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে জাতীয় সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সিডিএমপি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অন্যদিকে নগর পর্যায়ে বিভিন্ন নগরের দুর্যোগ ঝুঁকি মানচিত্র ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' এবং নগর এলাকায় ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সের মাধ্যমে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ করা সম্ভব নয়, এটি সত্য। তবে আমাদের সবার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে যে-কোনো দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব। আমরা সবাই মিলে সেই সম্ভাবনাটিকেই কার্যকর করে তুলতে চাই।

লেখক: মিডিয়া কর্মী ও প্রাবন্ধিক

গবেষণা নিবন্ধ

সচিত্র বাংলাদেশ-এর পূর্বসূরি 'মাহে-নও'

ড. শিল্পী ভদ্র

'মাহে-নও' পূর্ব পাকিস্তানের একটি সচিত্র বাংলা মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। 'মাহে-নও' উর্দু শব্দ, এর অর্থ 'নতুন মাস' বা 'নতুন কথা' (ভাবার্থে)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানি ভাবধারা এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার্থে নিয়োজিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে 'মাহে-নও' অন্যতম। সাধু-চলিত রীতির বাইরে আরবি-ফারসি-উর্দু-তুর্কি শব্দ সহযোগে ভিন্নধারার 'বাংলা' এই পত্রিকা প্রকাশ হতো। এর প্রতিষ্ঠাকাল এপ্রিল, ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ এবং নভেম্বর, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশনা স্থগিত হয়। এটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯৭১- এর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর 'মাহে-নও' আর প্রকাশিত হয়নি। এর প্রথম সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয় আবদুর রশিদের সম্পাদনায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে, পত্রিকায় এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখও লেখা হয়েছিল। ভোলানাথ বাসক কর্তৃক শ্রীকান্ত প্রেস, ৫ নয়াবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং পাকিস্তান পাবলিকেশন্স এর পক্ষে এম. আরশাদ হোসেন কর্তৃক করাচি থেকে প্রকাশিত হতো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রণ আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশনা– বেশিদিন এই নিয়ম মানা সম্ভব হয়নি। ফলে ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ঢাকা থেকেই প্রকাশিত হয়। ঢাকা আগমন-সম্পর্কে ঐ সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) বলা হয়:

> 'মাহে-নও'র নিজস্ব দফতর কায়েম হয়েছে। 'মাহে-নও'কে সর্বাঙ্গ সুন্দর মাসিক পত্রিকায় পরিণত করা মোনতাজেমগণের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। 'মাহে-নও'র ক্রমোন্নতির কোশেশ আমাদের কাম্য। ফলাফল আল্লাহর রহমত এবং লেখক-লেখিকা ও পাঠক-পাঠিকাগণের সাহায্য-অনুভূতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। আমরা কামনা করি সকলের নেক নজরে হামদর্দী ও মেহেরবানী।'

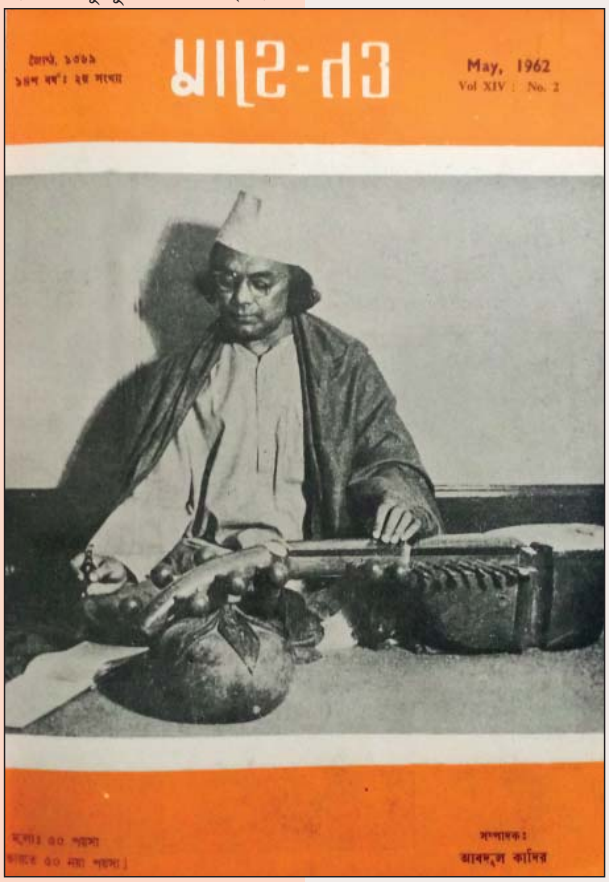

নিয়মিতভাবে প্রকাশিত পত্রিকাটির ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ২য় বর্ষের ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন আবদুর রশিদ। ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা থেকে ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যার সম্পাদনা করেন মীজানুর রহমান। ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা থেকে ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। ৪র্থ বর্ষের ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১৩৫৯) থেকে ১৬শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন আবদুল কাদির। ১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১৩৭১, ডিসেম্বর, ১৯৬৪) থেকে পরবর্তী সময়ে পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তালিম হোসেন।

অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি 'মাহে-নও' পত্রিকায় লিখেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন– মুহম্মদ আবদুল হাই, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল, আবুল ফজল, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, বন্দে আলী মিয়া, আহমদ শরীফ, সিকান্দার আবু জাফর, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবু রুশদ, শামসুর রাহমান, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সরদার জয়েন উদ্‌দীন, আবু জাফর শামস্‌উদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শাহেদ আলী, মাহবুব-উল-আলম, আশরাফ উজ-জামান, মিন্নাত আলী, মকবুলা মনজুর, ফরিদা হোসেন, হেলেনা খান, কাজী আবুল হোসেন, ইবরাহীম খাঁ, আবদুর রহমান প্রমুখ।

লেখক-বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রের বিবেকস্বরূপ এবং প্রায়শ তাদের প্রকাশিত লেখায় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সমাজ-মানসের বিবিধ গতি-প্রকৃতি ফুটে ওঠে। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরপরই পাকিস্তানি আদর্শে-বিশ্বাসী সাহিত্যিকেরা ঢাকায় এবং কলকাতায় সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান-সৃষ্টির পর তাদের প্রচেষ্টায়, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ও ব্যবস্থাপনায় আত্মপ্রকাশ করে 'মাহে-নও'পত্রিকা। পাকিস্তানের 'তাহজীব-তামাদ্দুন'-এর ভিত্তিতে নতুন লেখক সৃষ্টি, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংহতি, ভাষাগত ও জীবনাচরণগত পার্থক্য ঘুচিয়ে সাংস্কৃতিক ঐক্য, ধর্ম-বিশ্বাসের বন্ধনে এক জাতি সৃষ্টির জন্যই মূলত 'মাহে-নও' পত্রিকার জন্ম। এতে বাংলায় প্রকাশিত মূল্যবান লেখাগুলো ইংরেজি 'পাকিস্তান', উর্দু 'মাহে-নও' ও সিন্ধী 'নই-জিন্দেগী'-তে তর্জমা হতো। তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিচারে কৃষ্টিকলা ও সমাজ-কাঠামোতে ক্রমবিকাশের অনিবার্য প্রক্রিয়ার প্রভাব এর সর্বত্র। সাহিত্য জনবিচ্ছিন্ন নয় বরং জনমানস, রাজনীতি, আর্থসামাজিকতার যথার্থ সংশ্লেষ। এজন্য 'মাহে-নও' পত্রিকা প্রকাশনার সমকালীন রাজনীতি, আর্থসামাজিক অবস্থান এবং জনমানসের গতিপ্রকৃতির ধারাবাহিকতাটি জানা প্রাসঙ্গিক।

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় 'আমাদের কথা' শিরোনামে সম্পাদক লিখেছেন–

> আল্লার রহমতে সমস্যা ফয়ছলা করিয়াই আজ বাংলার সাহিত্যিক ও পাঠকদের সামনে 'মাহে-নও' লইয়া হাজির হইলাম। প্রচার বা কোন কিছুর মামুলী প্রোপাগাণ্ডা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার আদর্শ পাকিস্তানের তাহ্‌জীব ও তামাদ্দুন। ইহার উদ্দেশ্য দেশের প্রবীণ সাহিত্যিকদিগকে কদর দেওয়া ও নয়া আজাদীর আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট নবীন লেখক, লেখিকা সৃষ্টি করা। বিগত যুগের সাহিত্যিকদের আদর্শে আজাদীর রং ফলাইয়া অনাগত

> যুগের সাহিত্যিক জন্ম নিলেই আমরা আমাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। এজন্যই ইস্তেক্‌বাল্ জানাইতেছি প্রবীণ ও নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে সমভাবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ধারা এবং শব্দসম্ভার সৃষ্টি নিয়েও এতে আলোচনা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ লক্ষ করেছিলেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার শৈশব অবস্থায় মুসলমান বাদশাহ্ এবং আমীর ওমরাহ্দের সুনজরেই প্রতিপালিত হয়েছিল। এ ধারণাটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন। তবে তিনি অন্য ধর্মাবলম্বী শাসকদের অবদানও স্বীকার করতেন। কিন্তু 'মাহে-নও' শুধু মুসলিম তথা পাঠান শাসকদের অবদান উল্লেখ করে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়েছে।

এ প্রবন্ধেই আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা ভাষা পাঁচ মিশালি ভাষা। সে ধারার অনুসরণ করেই সম্পাদকীয়তে অনুমান করা হয়েছে, মুসলমান সমাজে প্রচলিত বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারের প্রায় অর্ধেক শব্দই আরবি-ফারসি থেকে গৃহীত; সে সকল শব্দের সমবায়ে গঠিত ভাষাই 'প্রকৃত প্রস্তাবে মাশরেকী পাকিস্তানের সত্যিকার সাধারণ মাতৃভাষা।'

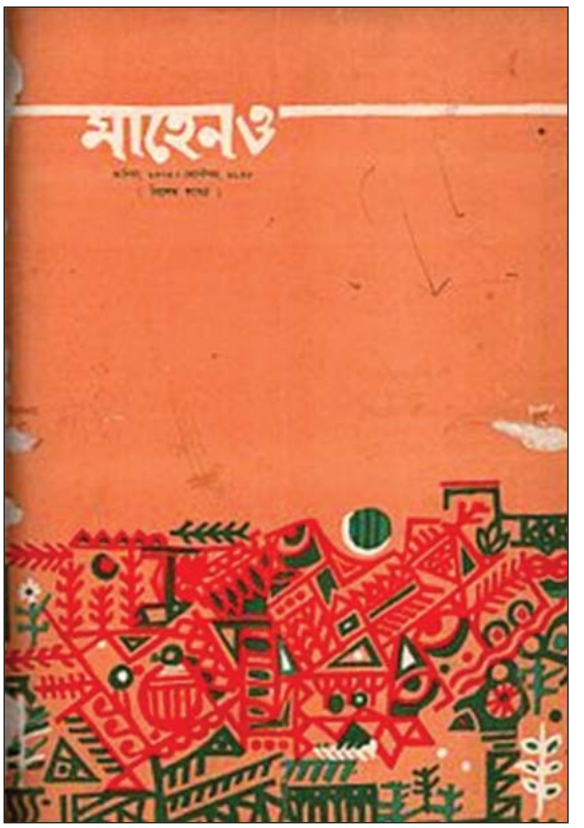

প্রবন্ধটিতে পাকিস্তানের সাহিত্য জগতে কোরান শরীফের ভূমিকাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য লেখকদের কোরানকে আদর্শ ও অনুপ্রেরণার প্রতীকরূপে গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শুধু পরামর্শ বা উপদেশ দিয়েই প্রবন্ধকার নিরস্ত্র হননি। পাকিস্তানে বাংলা ভাষা ও বাংলা রচনার আদর্শ কী হওয়া উচিত তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত ও উপস্থাপন করেছেন। পুরো সম্পাদকীয়টি সে আদর্শ-শৈলীতে রচিত :

> গোজাশ্‌তা এশায়াতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখ্‌তাসারভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল্ সকলকে স্বীকার করতেই হবে যে, শৈশবে মাতৃভাষা মুসলমান বাদশাহ্ এবং আমীর-ওমরাহদের নেক নজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারে শান-শওকত হাসিল করেছিল।

এ দু-তিনটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে 'মাহে-নও' পত্রিকার সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায় :

ক. সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে বিধায় পাকিস্তানি আদর্শকে সাহিত্যে-রূপায়িত করতে হবে। সে আদর্শের ভিত্তি ইসলাম; কাজেই ইসলাম এবং কোরানভিত্তিক নীতি ও আদর্শ অবলম্বন হবে নতুন সাহিত্যের।

খ. বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিকদের সর্বজনস্বীকৃত মতবাদকে পাশ কাটিয়ে তারা ভিন্নমত প্রচার করেছিলেন। বাংলা ভাষা জন্ম থেকেই পাঁচমিশালি ভাষা তা প্রচার করে তারা বিপুল সংখ্যায় আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহারের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

গ. বাংলা-সাহিত্য হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সবার অবদানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হলেও এ পত্রিকায় শুধু মধ্যযুগের মুসলমান সুলতানদের অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

ঘ. বিগত যুগের সাহিত্যিকদের আদর্শের রং মিলিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা।

ঙ. ধর্ম-বিশ্বাসের বন্ধনে দুই অংশের মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করা এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতি বৃদ্ধি করা।

ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ ছোটোগল্পের নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পরসে সর্বদা জারিত হতে পারে না তবে সময়ের পটভূমিকায় জীবনের গদ্যগাথা এই সত্য প্রতিপাদন করে যে সময়ই মূল নায়ক, সময়ই নিয়ামক এবং কালপ্রবাহই মূলধারা। ইতিহাসের নিরলস অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে সমসাময়িক সাহিত্যের মর্মোদ্ধার সারস্বত সাধনা। হিন্দু-মুসলমানদের লেনদেন ও যোগাযোগের মাধ্যমে যে অখণ্ড সাংস্কৃতিক সত্তা গড়ে উঠেছিল তারই একটি অংশ 'মাহে-নও' পত্রিকার ছোটোগল্প ও সাহিত্যের ধারা। ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ মানুষের আত্মার গভীরে প্রসারিত কিন্তু অতীতের অন্ধ-অনুকৃতি সাহিত্যের নান্দনিক দিককে সমূহ ব্যাহত করে। গণরুচি ও গণবিচারে যা শিল্প-উত্তীর্ণ তাই অমরত্ব লাভ করে। রাজনীতি ও যুদ্ধ, পাকিস্তানের সংহতি, দারিদ্র্যের অভিঘাত, দাঙ্গাতক্ষণ – এতদসংক্রান্ত দর্শন এবং মানবিক মূল্যবোধ 'মাহে-নও'র গল্পগুলোতে ফল্গুধারার মতো প্রবাহমান। রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিবিন্দু এর শিল্পকৌলিন্য। পাকিস্তানি শাসনের পরিকাঠামো, ঘটনাঘন জীবন-কথায় সম্পৃক্ত। গল্পগুলোর পটভূমি 'সময়' অতীতের ঐতিহ্যের সাথে বর্তমানের পটপ্রেক্ষিতের মেলবন্ধন ঘটার প্রয়াস পেয়েছে। অন্বেষা, জীবন-দর্শন, রাজনীতি-সচেতনতা, সাংস্কৃতিক-সংহতির রূপরেখা, নৃতত্ত্ব, স্বকীয়তার চেতনা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা– ইত্যাকার অনুষঙ্গ নির্মাণ করেছে ছোটোগল্প ও গদ্য সাহিত্যের শরীর। গল্পগুলোর বিশ্লেষণ পটপ্রেক্ষিতের মানসক্রিয়ায় স্নাত এবং তা কদাচ দুর্নিরীক্ষ নয়।

'মাহে-নও' প্রধানত সাহিত্য-পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। বেসরকারিভাবে ঢাকা থেকে সাহিত্য-বিষয়ক আরো পত্রিকা বের হয়। এতে পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তথ্যাদির পাশাপাশি গল্প, কবিতা, জীবনী, প্রবন্ধ, পল্লি-সাহিত্য, রম্য-রচনা, স্মৃতিকথা, সংগীত, গজল, নাটক, উপন্যাস, কথিকা, সাহিত্য সমালোচনা বের হয় মাহে-নও পত্রিকাটিতে। পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল 'কিতাব মহল'। এতে মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের পুস্তকের পরিচয় ও সমালোচনা করা হয়। বলা যায়, 'মাহে-নও' পত্রিকা ছিল পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আদর্শ প্রচারের মাধ্যম। সর্বশেষ সংখ্যা ছিল ১৯৭১ সনের নভেম্বর (১৩৭৮ সনের অগ্রহায়ণ মাস), ২৪ বর্ষ ৮ম সংখ্যা।

লেখক: 'মাহে-নও' বিষয়ে পিএইচ.ডি. গবেষক ও প্রাবন্ধিক

গবেষণা নিবন্ধ

ছড়া-কবিতায় শেখ রাসেল

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

স্বপ্নীল সুন্দর সম্ভাবনার বর্ণিল শিশু শেখ রাসেল। বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল। রাসেলের মাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। অত্যন্ত ছটফটে এবং মেধাবী ছিল শেখ রাসেল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের বাসায় ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর রাত দেড়টায় শেখ রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। ফুলের মতো সহজ, সরল, সুন্দর শিশু শেখ রাসেল। ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট ঘৃণ্য কালরাতে পথভ্রষ্ট উচ্চাভিলাষী, কতিপয় সেনা, হত্যাযজ্ঞে মাতে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে। শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত কবি-শিশুসাহিত্যিক আসলাম সানীর ভাষায়, 'নিরপরাধ অবুঝ-অবোধ শিশু শেখ রাসেলের মুখ, তার কাকুতি-মিনতি বেঁচে থাকার বাসনা-স্বপ্নকে হত্যা করেছে যারা সেই মহাকালের চরম ধিক্কৃত নিন্দিত অভিশপ্ত ঘাতক'। বাংলাদেশের লেখক কবি, ছড়াশিল্পীরা তাদের প্রতি চরম রোষ এবং ঘৃণা প্রদর্শন করে– শেখ রাসেলের প্রতি পরম মমতা ভালোবাসায় অন্তরের সবটুকু আবেগ ঢেলে লিখে চলেছেন পঙ্‌ক্তিমালা, কাব্য, পদাবলি-ছন্দ উপমাঋদ্ধ পদ্যগুচ্ছ, কথা-বাণী এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করার চেষ্টা করা হলো।

পনেরো আগস্টের কালরাতের হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মানবতা এবং বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষ চিরদিনই ধিক্কার-ঘৃণা জানাবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কবি-ছড়াশিল্পীরা তাদের ছন্দিত প্রয়োগে নন্দিত উপস্থাপনার ডালা সাজিয়ে চলেছেন প্রতিনিয়ত।

নরপিশাচ বোঝেনি হায়, যে শিশু/হত্যালীলার ভেতর যেতে চায় মার কাছে।
সে নিশ্চিত যায়, মা তো মহাকাল/ মহাজীবন ফুটে থাকে নিষ্পন্দ পিতৃবাহুতে।
জানে না পিশাচ, মৃত্যুসুখে যে শিশু/মার কাছে যেতে চায়,
সে মূলত যায় জ্যোতিস্নানে যা মহাকাল/মহাজীবন ফুটে থাকে নিষ্পন্দ পিতার মুখে।

[শিহাব সরকার : *যে শিশু মার কাছে*]।

এ ধারাবাহিকতায় বাদ যায়নি এপার-ওপার বাংলার কোনো কবি-লেখক-সাহিত্যিকরা।

তুইতো গল্পের বই, খেলনা নিয়ে/সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন বয়সেতে ছিলি-
তবুও পৃথিবী আজ এমন পিশাচী হলো/শিশু রক্তপানে গ্লানি নেই?
সর্বনাশী আমার ধিক্কার নে!
যত নামহীন শিশু যেখানেই ঝরে যায়
আমি ক্ষমা চাই, আমি সভ্যতার নামে ক্ষমা চাই।
[সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়: *শিশু রক্ত*]।

রাসেল এখন ছবি
তাকে নিয়ে লিখছি আমরা / লিখছে যত কবি
সবার লেখায় একটা কথা / শেখ রাসেলের জন্য
তাকে যারা করছে হত / তারা পশু বন্য।
[আলম তালুকদার : *রাসেল এখন ছবি*]।

ফুলের মতো পবিত্রতার সৌরভে সুরভিত রাসেল বাঙালির অতি আদরের–
শেখ রাসেলকে মনে আছে? / জাতির পিতার ছেলে
ছিলো ছোট্ট রাজপুত্তুর / উড়তো ডানা মেলে।
পঙ্খীরাজে চড়ে সে যে / ছুটতো অবিরত
অভিযানে সুদূর পানে / নীলকমলের মতো।
রইলো পড়ে পঙ্খীরাজটা / থামলো অভিযান
হয়নি শোনা নকুল দিনে / নীলকমলের গান।

তাইতো রাসেল চিরশিশু / না ফোটা এক ফুল
যার জন্য আমরা আজও / কেঁদে হই আকুল।
[সুজন বড়ুয়া : *না ফোটা এক ফুল*]।

খ্যাতিমান লেখকরাই তার চিত্র আঁকেন তাঁদের ছন্দিত লেখনিতে–

শিশু মানেই ফুলের মতো / শিশু মানেই ভালো
শিশু মানেই জগৎ জুড়ে / ছড়িয়ে দিলো আলো
আলোর ভুবন ভরিয়ে দিয়ে / ঘুচাও অন্ধকার
শেখ রাসেলের জন্মদিনে / নতুন অঙ্গীকার।
[আমীরুল ইসলাম : *নতুন অঙ্গীকার*]।

অনন্তকালের যিশু সদৃশ্য নিটোল পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক চিরকালের শিশুই তো রাসেল। তার নির্মম পরিণতি লেখকের রচনায় নিরুপম হয় অতি নিখুঁতভাবে–
কলুষিত করেছে বাংলাদেশের আলো-জল-বায়ু-প্রকৃতিকে
সেই চির শিশু-বাংলা ও বাঙালির হৃদয়ের ধন
জাতির জনকের প্রাণ ভ্রমরা শেখ রাসেল আজ/অনন্তকালের যিশু-চিরকালের শিশু
তাই দেখো আজ বাংলার বর্ণমালা শব্দ-স্বর
তাল-মাত্রায়-লয়-ছন্দ-সূর্যের আলো-চাঁদের জোৎস্না
কষ্টে কুঁকড়ে কুঁকড়ে কেঁদে ওঠে আর/করুণ আর্তিতে শোকাচ্ছন্ন বাংলার গরবিনী ইতিহাস।
[আসলাম সানী: *অনন্তকালের যিশু চিরকালের শিশু*]।

কলি থেকে সদ্য ফোটা রাসেলের খুনিদের বিচার দাবিতে সোচ্চার লেখক-কবিদের লেখনি–

রাসেল আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে/একটি বেগুনি ফুল
সেই ফুলটাও দাবী জানাচ্ছে/করো নাকো আর ভুল।
বাকি পশুদের ফাঁসিতে ঝোলাও/এটা হোক সংবাদ
বিচার চাইছে আকাশ বাতাস/ফুল পাখি আর চাঁদ।
[সারওয়ার উল ইসলাম: *শেখ রাসেলের কী দোষ ছিল*]

প্রজাপতির পাখায় রোদের ঝিলিক, ভোরের কচি দুর্বাঘাসে শিশির- এসব কিছু দেখার আগেই, কালো দানব হামলে পড়ে তার ওপর–

রাসেল নামের একটি ছেলে / ফুলের মতো জীবন ছিল যার,
লক্ষ রঙিন স্বপ্ন আশা / ছোট্ট বুকে করত খেলা তার।
সবুজ-ঘেরা এদেশটাকে / হয়নি দেখা মুগ্ধ দু'চোখ ভরে;
ধানের মাঠে সকাল-সাঁঝে / মাতাল হাওয়া নাচে কেমন করে!
এসব কিছুই প্রাণটি ভরে / হয়নি দেখা, হয়নি ছোঁয়া তার
হঠাৎ করেই অন্ধকারে / হামলে পড়ে ঘাতক হানাদার।
[মুস্তাফা মাসুদ: *রাসেল নামের ছেলেটি*]।

জন্মগতভাবেই বড়ো হওয়ার স্বপ্ন ছিল চোখে। কবি-ছড়াকারেরা সেই স্বপ্নের বর্ণনা তাঁদের লেখায় তুলে ধরেন নিপুণ ছন্দের নৈপুণ্যে–

ভাইয়া যদি ধমক লাগায় বোনের আঁচল তলে
তোমরা যেমন লুকাও গিয়ে বিচিত্র কৌশলে,
দুষ্টুমি আর খুনসুটিতে ভরিয়ে সবার বুক
তোমরা যেমন পাও খুঁজে সব সত্যিকারের মুখ-
সেই ছেলেরও বুকের ভেতর ছিলো সুখের পাখি
এবং উদার আকাশ ছিলো, খবর রাখো তা কি?
দু'চোখ ভরা স্বপ্ন ছিলো, আর ছিলো তার সাধ
প্রয়োজনে বাবার মতোই করবে প্রতিবাদ।
[রফিকুর রশিদ: *একটি শুধু প্রশ্ন*]।

শিশু রাসেলের স্বপ্নকে মনের একান্ত মাধুরী মিশিয়ে ছড়াকার তাঁর ছন্দের ঝংকারে অপরূপ রূপে সাজিয়েছেন–

রাসেলের হাসি। স্থির হয়ে আছে। ছবিটার অ্যালবামে
নিষ্পাপ মুখ। সুখ ভরা হাসি/দু'চোখে স্বপ্ন ঝরে রাশি রাশি
এ যেন এক ছবির কবিতা সোনায় মোড়ানো খামে।
[আনজির লিটন: *রাসেলের হাসি*]।

সৌন্দর্যের নির্মলধারা প্রতিশোধ-প্রতিবাদের ভাষা হয় সাবলীল রূপময়–

রাসেলকে ওরা হত্যা করেনি / হত্যা করেছে ফুলকে
দুমড়ে-মুচড়ে গুড়িয়ে দিয়েছে / মানবিকতার মূলকে।
খুনিরা মানুষ-এটা ভাবলেই / লজ্জায় বুজি মুখটি,

প্রতিশোধ নয়, প্রতিবাদ আজ / ঘৃণায় জড়ানো বুকটি।
[ওয়াসিফ-এ-খোদা: *রাসেলের জন্য*]।

রাসেলের খুনের জঘন্যতম ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে সাক্ষী হয়ে কথা বলবেই–

অতি লোভী নরপশু বন্দুকবাজরা/রাসেলের কচি বুক করে দিল ঝাঁঝরা
দিন যায় দিন আসে ইতিহাস ডাকবেই/একজন কোটি হয়ে রাসেলেরা জাগবেই।
[সুকুমার বড়ুয়া: *রাসেলেরা জাগবেই*]।

পনেরো আগস্টের খুনিরা শেখ রাসেলকে ভবিতব্য ভেবেই মহাশঙ্কিত ছিল। ছড়াকারের ছন্দিত কলমে তা লক্ষ করার মতো-

ফুটেছিলে ফুল হয়ে / বিকশিত হতে
স্বপ্নের জাল বুনে / সময়ের স্রোতে।
চেয়েছিলে হতে তুমি / প্রজাপতি-মেঘ/
তাই খুনিদের মনে / বাড়ে উদ্বেগ।
তাই তারা টেনে দিলো / স্বপ্নের ছেদ
খুনিদের চোখে কোনো / নেই ভেদাভেদ।
হিংসার গুলি চলে / রাসেলের বুকে
মরেও অমর আজও / থাকো মহাসুখে।
[কামাল হোসাইন: *অমর তুমি*]।

রাসেল যখন ছন্দিত নন্দনতত্ত্বের বিষয় হয়ে ওঠে লেখার ছত্রে ছত্রে।

পঁচাত্তরের রাত্রে থেকে / ঐ আকাশের তারায়
রাসেল একটি তারা হয়ে / জ্বলে আকাশ পাড়ায়।
রাসেল সোনার মুখটি আমার / যখন মনে পড়ে
ঐ আকাশে রাসেল দেখি / ঝলোমলো করে।
রাসেল শোনো তোমার আছে / লক্ষ-কোটি ভাই
সব ঘাতকের করবো বিচার / কারোর ক্ষমা নাই।
[নাসের মাহমুদ : *রাসেল*]।

'আমি মায়ের কাছে যাবো, আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাও' -রাসেলের সেই করুণ আকুতি, কবি তার কবিতায় চিত্রায়ণ করেন শব্দের ব্যঞ্জনায়–

দত্যিপুরীর সৈন্য এসে মারলো তাকে/আকাশ জুড়ে ভোরের আলো ফোটার আগে
খানিক আগে ঘুমিয়ে ছিলো মায়ের কোলে/সেই মা এখন নিজেই ঘুমোয় রক্ত লালে।
ছোট্ট রাসেল কেঁদে কেঁদে/মা মাগো মা
আমি মায়ের কাছে যাবো-----।
[কাজী রোজী: *আমি মায়ের কাছে যাবো*]।

ঘাতক পিশাচরা অবশেষে সত্যি সত্যি রাসেলকে নিয়ে গেলো তার মায়ের কাছে। তাদের অমানবিক মানসিকতার বিকৃত স্বরূপে–

রাসেল রাসেল কোথায় রাসেল / মায়ের কাছে আয়
রক্তে ভেজা রক্ত গোলাপ / মায়ের আঁচল ছায়।
রাসেল রাসেল কোথায় রাসেল / বাবার কাছে আয়
রক্তে ভেজা শরীর দেখে / রাসেল কাঁদে হায়।
রাসেল রাসেল কোথায় রাসেল / রাসেল রক্তে ভাসে
কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেছে / মায়ের কোলের পাশে।
[বেবী মওদুদ: *রক্তগোলাপ রাসেল*]।

জাতির পিতাসহ তাঁর পরিজন কারবালার প্রান্তরের রক্তে ভেজা নির্মম করুণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন– কবির সৃষ্টি নৈপুণ্যে তা বর্ণিল হয়ে ওঠে এভাবে-

মহরমের মাতম শুনি ধানমন্ডির বুকে/লেকের পানি নিথর চোখে কান্না ঝরায় দুখে
শোকের মাতম ছড়িয়ে পড়ে, উধাও শান্তি-সুখ/বুলেটবিদ্ধ বঙ্গবন্ধু, বাংলা মায়ের মুখ।
তার সঙ্গে একটি শিশু রক্তস্রোতে ভেসে/নিসর্গ দেয় লাল রঙা বেশ সারা বাংলাদেশে।
আকাশে নেই সূর্য তবু রুদ্র খরতাপ/কেমন ছিল সেই শিশুটি? নিষ্পাপ! নিষ্পাপ!
রাসেল নামের সেই শিশুটির জন্য আমার মন/বিলাপ করে হাওয়ায় হাওয়ায় দুঃখ সারাক্ষণ।
[রাশেদ রউফ: *সেই শিশুটির জন্য*]।

ঠিক কোন দোষে নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলকে হত্যা করা হলো, এ প্রশ্ন সকলের মতো কবি ছড়াকারের

কোন দোষেতে রাসেল সোনা রং মাখানো শৈশবে
রক্ত মাখা নিথর শরীর পরিণত ওই শবে?
বন জুড়ে আজ পাখির মেলা, নদীর বুকে ঢেউ
রাসেল সোনা কোথাও নেই, দেখবে না আর কেউ।
বলবে না আর কোনো কথা, খেলবে না আর মাঠে
হাজার মানুষ ছুটবে দেখি রাসেল তো নেই হাটে।
আকাশ পাড়ে তারারা আজ নীরব হয়ে জ্বলছে
একটি তারা বাংলা ভাষায় মনের কথা বলছে
তারাতো নয় রাসেল সোনা ফুটছে মিটিমিটি
পাঠিয়ে দিলো এই আঁধারে একটি আলোর চিঠি।
[ওমর কায়সার: *একটি আলোর চিঠি*]।

শেখ রাসেল ফুল, পাখি, প্রজাপতি, বন প্রকৃতি, সত্য-সুন্দরের যেন সমার্থক। তাই লেখক, কবি, ছড়াকার–

রাসেল রাসেল ডাকে মায়/রাসেল গেল হাওয়ার নায়
আয়রে রাসেল ঘরে আয়/তোকে খোঁজে বাংলা মায়।
মারলো তোকে দত্যি দানো / তাতে হলো কী!
দেখ না এসে আমরা সবাই / রাসেল সেজেছি।
রাসেল রাসেল দেখে যা/জাগলো আবার বাংলা মা
শ্লোগান যেন হয় না শেষ/'রাসেল মানে বাংলাদেশ'।
[রহীম শাহ: *ও রাসেল*]।

যেন সকলে ডাকছে রাসেলকে। ডাকে জনমদুখী বোন হাসু-রেহানা'পু–

আয় ফিরে আয় রাসেল তুই/ডাকছে তোকে শাপলা জুঁই।
কান্না ভেজা পাখির সুর/গেছিস কী তুই অনেক দূর?
হাসু আপার চোখের জল/ফুরায় না ক্যান? রাসেল বল?
জনমদুখী বোনটি তোর/আনল দেশে নতুন ভোর
নতুন ভোরে নতুন দিন/শোধ হবে তোর রক্ত ঋণ।
[লুৎফর রহমান রিটন: *রাসেল রাসেল ডাক পাড়ি*]।

রাসেলের বিয়োগ-ব্যথার বিবরণ খ্যাতিমান কবিরা নানান আঙ্গিকে যে যার মতো করে উপস্থাপন করেছেন–

টুঙ্গিপাড়ার পাখি আজও কাঁদে / দোয়েল ভুলেছে গান
হঠাৎ কেমন হয়ে যায় যেন / ঘাস ফড়িংয়ের প্রাণ।
মধুমতি পাড়ে আছড়ে পড়েছে / ছোটো ছোটো ঢেউগুলো
শোকের কষ্ট জানাতে উড়ছে / এখনো পথের ধুলো।
ধানমন্ডির পায়রা ডাকে না / গায় না যে বুলবুল
ফোটে না চামেলি, শুধু ফোটে থাকে/ রক্ত করবী ফুল।
কারণ তাদের ছোট্ট বন্ধু / রাসেল নেই, তাই-
বুকের কষ্টে হাহাকার হয়ে / বাতাসে ছড়িয়ে যায়।
[ফারুক নওয়াজ: *পায়রা ডাকে না*]।

এই রাসেল কারোর কাছে সন্তান, আবার কারোর কাছে শুধুই প্রিয় ভাই–

লাল-সবুজের পতাকাটার / লাল কেন হয় গাঢ়
সহজ বটে প্রশ্নটা তার / জবাব দিতে পারো?
যতই সহজ প্রশ্নটা হোক / জবাব তো নয় শক্ত-
কারণ, সেথায় মিশে আছে / আমার ভাইয়ের রক্ত।
আমার সে ভাই তোমার আমার / সবার প্রিয় ভাই
রাসেল রাসেল প্রিয় সে নাম / শুনতে শুধু পাই।
[তপন বাগচী: *রাসেল আমার ভাই*]।

নানান শব্দের বর্ণিল সাজে সজ্জিত করে তোলে রাসেলের জন্মদিনের শুভক্ষণকে–

বর্ষা রাতে টাপুর টুপুর স্বপ্ন মায়ার ঘুম
আদর সোহাগ নরোম গালে এবং মায়ের চুম।
জোছনা রাতে নীলপরিরা খবর নিয়ে এলো
খুশির হাওয়া চতুর্দিকে বইছে এলোমেলো
খবরখানা ছোট্ট অতি রাসেল সবার মিতা
জন্মদিনের পদ্যিখানা নয়কো মোটে গীটা।
[খালেক বিন জয়েনউদদীন: *জন্মদিনের পদ্যিখানা*]।

কখনো সে চাঁদ। কখনো সে চাঁদের আলো। কখনো বা সাত রাজ্যের হীরামানিক ধন, রাজপুত্র–

পদ্মা-মেঘনা-যমুনার কূলে কূলে/ কাশের বন হাসতো দুলে দুলে
জন্মদিনে রাজপুত্রের ঘর/ থাকতো ভরে উপহারের ফুলে।
আবার এসেছে আঠারো অক্টোবর/ বত্রিশে কাঁদে রাজপুত্রের ঘর
ধানমন্ডির লেকের জলও কাঁদে/ বড়ো দু'বোন পাষাণে বুক বাঁধে।
[পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়: *রাজপুত্রের জন্মদিন*]।

এই জন্মদিনে অনেক কথাই মনে পড়ে। রাসেলের সাথে সাথে জাতির পিতার কথা, বঙ্গমাতার কথা মনে পড়ে। এরই সাথে উঠে আসে হাসিনা-রেহেনা আপুর প্রসঙ্গ। এমন চিত্রকল্পও লেখকের রচনার বিষয়বস্তু হয় যখন–

বাবুই টিয়া গান ভুলেছে করে না হইচই-
আজ রাসেলের জন্মদিনে রাসেল সোনা কই?
রক্তজবা, জুঁই, চামেলি, গোলাপ বনের পাখি
করুণ সুরে রাসেল রাসেল করছে ডাকাডাকি।
'হাসু আপু' বলে বলে কেউ কি এখন ডাকে
কারা বলো থামিয়ে দিলো আমার বাংলা মাকে?
জাতির পিতার শুভ স্বপ্ন কাড়লো বলো কারা?
আকাশ, মাটি, বাংলা মায়ের শত্রু হলো যারা।
[শাফিকুর রাহী: *আজ রাসেলের জন্মদিন*]।

রাসেলের 'সাইকেল' অনুষঙ্গও ছড়া-কবিতায় চমৎকারভাবে স্থান পায়–

সাইকেলটা জাদুঘরে / পথ চেয়ে রয় ওর
তেমনি আসে রাতের শেষে / নিত্য নতুন ভোর।
কিন্তু রাসেল আসে না, তাই/ সাইকেলটার আরোহী নাই
দেখতে গিয়ে বুকে জাগে কি যে হাহাকার/ কাঁপলো না হাত ঘাতক পশুর
ফুটফুটে ওই মুখ দেখেও / করতে গুলি তার?
[নাসির আহমেদ: *রাসেল সোনা*]।

ছড়াকারের ছড়ায় আরো উঠে আসে–

বাংলা জানে / জগৎ জানে / সেই ছেলেটি রাসেল
খুশি হতো / যদি পেতো / তিন চাকার সাইকেল।
[ফজল-এ-খোদা: *হায় রাসেল শেখ রাসেল*]।

নানাভাবে নানাজনের লেখায় রাসেলের প্রিয় 'সাইকেল'- এর প্রসঙ্গ যে এসেছে তার কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা নেই।

সাত সকালে ধানমন্ডির / বদলে গেছে সব
হাসিখুশি মিলনমেলা / কোথায় কলরব।
চেনা জগৎ বাইসাইকেল / মুখ থুবড়ে বুকে
ধিক্কৃত সব হায়না-দানোর / কাণ্ড দেয়াল টুকে।
অনেকটা পথ যাওয়ার ছিল / স্বপ্ন ছিল মেলা
হিংস্র বাজের নখর থাবায় / জীবন হেলাফেলা।
[বিপুল বড়ুয়া: *রাসেলের জন্যে*]।

আবার এই প্রিয় সাইকেল-এর বিনিময়ে নিজের জীবন ভিক্ষা চাওয়ার করুণ আর্তি ফুটে ওঠে–

কান্নাকাটি করেও রাসেল পায় না মায়ের সাড়া
পেছন ফিরে দেখলো রাসেল এক হায়েনা খাড়া
মায়ের থেকে ছিনিয়ে নিল একটুখানি দূরে
ঠিক তখনই ভোরের আজান হচ্ছে করুণ সুরে।
'খেলনাপাতি সবই দেব, সাইকেলটাও নিও
বিনিময়ে তোমরা আমায় বাঁচতে শুধু দিও'।
[পাশা মোস্তফা কামাল: *রাসেলের কান্না*]।

শেখ রাসেলকে নিয়ে রচিত কবিতা ছড়া, বিষয়বস্তু কষ্টের–

কান্নার ধ্বনি ওঠে অনুরণি / কাঁদে মাটি তৃণলতা
ফুল, পাখি, নদী শোকে বিহ্বল / বুকে চেপে নিরবতা।
আকাশ-বাতাস স্তব্ধ নীরব / গাছেরা কাতর শোকে
বনের পাখিরা ভুলে গেছে গান / জল ছলছল চোখে।
বাড়ির পোষা সাদা কবুতর / করে না তো আনাগোনা
কারণ তাদের সামনে এখন / নেই যে রাখাল সোনা।
[জাহাঙ্গীর আলম জাহান: *রাসেল আসছে*]।

একই বিষয়কে কেন্দ্র করেই নানান ছড়া-কবিতা রচিত হয়েছে–

বাবা মায়ের সঙ্গে সেদিন / রাসেল গেল কই
ছড়া-ছবির বইগুলো সব / ছড়িয়ে আছে ওই।
ছড়িয়ে আছে খেলনা গাড়ি / কয়টি দাবা গুটি
ইসকুলে রোজ ঘণ্টা বাজে / দপ্তরি দেন ছুটি।
ছুটির পরে সবাই ফেরে / রাসেল ফেরে না যে
'সোনা মানিক রাসেল কোথায় / কান্না হয়ে বাজে।'
[জসীম মেহবুব: *রাসেল তুমি নাই*]।

রাসেলের বয়স আট। রাসেলের বয়স বাড়েনি। রাসেল বেঁচে থাকলে কী হতো, কেমন হতো সে সম্পর্কে বয়ান করেছেন এভাবে–

স্বপ্নে রাঙা চোখ দুটো তার শিখার মতো জ্বলজ্বলে
বড়ো হলে ঝরনা হয়ে বয়ে যেতো কলকলে
কিন্তু বড়ো হওয়ার আগে মীরজাফর আর খন্দকার
কচি বুকটা ঝাঁঝরা করে দেশকে বানায় অন্ধকার।
থাকলে বেঁচে ছবির মুখটি পড়তো আজই পঞ্চাশে
নামতো দুখী বাংলাদেশের আমজনতার মন চাষে
হয়তো হতো বাবার মতো দুখিনী মার কাণ্ডারী
করতো পূরণ বাংলা মায়ের শূন্য যতো ভাণ্ডারই।
[এমরান চৌধুরী: *একটি ছবির কথা*]।

জাতির পিতার সাথে তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান রাসেলের তুলনা করে ছড়াকার লেখেন–

বঙ্গবন্ধু পিতা আমার / রাসেল আমার ভাই
তাইতো বুকে অপার সাহস / ভয়ের কিছু নাই।
বাংলা আমার মুখের ভাষা / এতেই লিখি ছড়া
কারণ আমি শেখ রাসেলের / রক্ত বীজে গড়া।
[আহমেদ জসীম: *রাসেলের রক্তবীজে*]।

ছোট্ট রাসেলসহ জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যাকারীদের বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। এতেই ছড়াকারের শান্ত্বনা–

পঁচাত্তরে রাসেল নামে / তুলতুলে এক ফুল
'বাঁচতে দাও বাঁচতে দাও' / কাঁদে কী আকুল!
কে শোনে কার কথা/ ব্যর্থ আকুলতা!
অবশেষে হলো বিচার / শান্ত হলো মন
ছোট্ট রাসেল জান্নাতে আজ / করছে বিচরণ।
[আবুল কালাম বেলাল: *ছোট্ট রাসেল*]।

রাসেলের বিয়োগ-ব্যথার কষ্ট–

বনের ধারে দোয়েল পাখি / গান গেয়ে যায় করুণ সুরে
কষ্টগুলো যায় ছড়িয়ে / বাংলা ছেড়ে বিশ্বজুড়ে।
পাখি বলে ওরে বোকা / জালিম না তুই কষ্ট কোথা?
আমার বন্ধু হারিয়ে গেছে / পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট রাতে
মনের ভেতর ব্যথার আগুন / জাগে প্রতিঘাতে।
[মালেক মাহমুদ: *স্মৃতির পাতায়*]।

রাসেলের বয়সি সকল বন্ধু তাকে বলছে, তোমাকে যারা বাঁচতে দেয়নি, তাদেরকেও আমরা পার পেয়ে যেতে দেব না। আমরা আছি, হাসিনা আপুর পাশে অতন্দ্রপ্রহরী হয়ে–

বাঁচতে চেয়েছে রাসেল যে ভাই / বাঁচতে দেয়নি যারা
স্বাধীন এ দেশ রুখবো তাদের / পার পাবে না তো তারা।
তুমি নেই তবু তুমি আছো ঠিক / কেঁদে ওঠে এই মন
আমরা তোমার হাসিনা আপুর / খুব যে আপনজন।
[সনজিত দে: *শিশু এ রাসেল*]।

বাংলাদেশের সকল শিশুর মাঝেই রাসেলকে খুঁজে পায় লেখকরা। রাসেল অবিনাশী– সব শিশুদের খেলার সুখে শেখ রাসেলের সুখ/ সোহাগমাখা সব শিশুতে শেখ রাসেলের মুখ।
সব শিশুদের ছবির মাঝে শেখ রাসেলের হাসি/ সব শিশুদের চোখের তারায় রাসেল অবিনাশী।
[কেশব জিপসী: *রাসেল অবিনাশী*]।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সবসময় দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা ভাবতেন। সারাদেশ ঘুরে বেড়াতেন। পৃথিবীর নানান দেশে যেতে হতো তাঁর। কখনো কখনো রাসেলও থাকতো বাবার সাথে। বাবার সাথে থেকে থেকে বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগত তার। শেখ রাসেলকে নিয়ে দেশের বরেণ্য প্রায় সকল কবি-ছড়াকাররা কোনো না কোনো সময়ে ঠিকই লিখেছেন, লিখেও চলেছেন অদ্যাবধি। তাদের তালিকা অবশ্যই দীর্ঘতর। এই অল্প পরিসরে কিছু পরিমাণ লেখকের লেখা উদ্ধৃত করার প্রয়াস চালিয়েছি মাত্র। আঠারোই অক্টোবর শেখ রাসেলের শুভ জন্মদিন। তার আত্মার শান্তি কামনা করছি। রাসেল বেঁচে থাকবে যুগ যুগ ধরে, যতদিন বাংলা, বাঙালি, বাংলাদেশ তথা মানবসভ্যতা বেঁচে থাকবে ততদিন। শেখ রাসেল। শুভ জন্মদিন।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

শারদীয় দুর্গোৎসব

প্রসেনজিৎ কুমার দে

আকাশে এখন ছেঁড়া মেঘের ভেলা। শহরের ইতিউতি কোথাও যেন কাশফুলের দেখা পাওয়া। আর ভোরবেলা শিউলি ফুলের গন্ধ। দিকে দিকে এখন দেবী বন্দনা। বছর ঘুরে উমা দেবী আসছেন তাঁর বাপের বাড়ি। ঢাকের কাঠি ঢেম কুড় কুড়, ঘন্টা- কাঁসার টিং টিং, মঙ্গল শাঁখ ও সধবা স্ত্রীর উলু ধ্বনি মায়ের আগমনে চারদিকে কেবল আনন্দ আয়োজন। হ্যাঁ, মা আসছেন! দেবী দুর্গা।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ বনানী মাঠে গুলশান-বনানী সার্বজনীন পূজা ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন –পিআইডি

এবার কৈলাস থেকে দেবী দুর্গার আগমন মর্ত্যলোকে নৌকায় চড়ে। যার অর্থ এই বসুন্ধরায় শস্য বৃদ্ধি-জল বৃদ্ধি। এবং দেবী গমন করবেন ঘোটকে চড়ে। যার অর্থ ছত্রভঙ্গস্তরঙ্গম অর্থাৎ ছত্রভঙ্গ বা লণ্ডভণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পঞ্জিকা মতে, এ বছর ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ (৯ই আশ্বিন ১৪২৪) মহাষষ্ঠী পর্বের মাধ্যমে শুরু হয়ে ক্রমে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ (১৩ই আশ্বিন ১৪২৪) দশমী পর্বের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের সমাপ্তি হবে।

হিন্দু ধর্মে আছে, 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। কিন্তু দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মালম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। আবহমানকাল ধরে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা পালন হয়ে আসছে। অশুভ শক্তির বিনাশ ও সুন্দরের আরাধনা দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দুর্গাপূজা সনাতনধর্মী বাঙালি চেতনার মানসপটে এক ঐতিহ্যবাহী সংহতির প্রতীক। দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব হলেও এর আঙ্গিক বাংলার মাটি ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে দুর্গাপূজা এক জাতীয় উৎসব। এ পূজা সকলের মিলনমেলায় রূপ নেয়; গড়ে ওঠে সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার। তাই গোটা উৎসবটি সার্বজনীন।

শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা এবং এ পূজা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব। পক্ষান্তরে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা বাসন্তীপূজা নামে অভিহিত। বাসন্তীপূজা এখনো প্রচলিত থাকলেও শারদীয় দুর্গাপূজাই আবহমানকাল থেকে মহাসমারোহে উৎসবাকারে পালিত হচ্ছে। শারদীয় দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তাই বেশি। তবে সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি তিথি যথাক্রমে মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়া দশমী। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষকে বলা হয় দেবীপক্ষ। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যার নাম মহালয়া।

বহুযুগ পূর্ব থেকেই দুর্গা দেবীর পূজা হয়ে আসছে। *মার্কণ্ডেয় পুরাণে* বর্ণিত আছে, প্রাচীনকালে রাজা সুরথ হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য বসন্তকালে দুর্গা দেবীর পূজা করেছিলেন। মা দুর্গার কৃপায় তিনি তার হারানো রাজ্য ফিরে পান। আবার *কালিকা পুরাণ* ও *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ* অনুসারে, কৃত্তিবাস ওঝার রচিত *রামায়ণে* উল্লেখ আছে, ত্রেতাযুগে রাবণ বধ ও সীতাকে উদ্ধারের জন্য দেবতা ব্রহ্মা শ্রী রামচন্দ্রকে দেবী দুর্গার আরাধনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে সময় ছিল শরৎকাল। এ সময়ে পূজা করার যথাযথ সময় না। কিন্তু শ্রী রামচন্দ্র ঐ সময়ে ষষ্ঠী,সপ্তমী এবং অষ্টমী তিথিতে চণ্ডীপাঠ করে দেবীর মহাপূজা আয়োজন করেন। যা অকালবোধন নামে পরিচিত। এজন্য শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালবোধষ্ঠী বলা হয়।

শারদীয় দুর্গাপূজার রয়েছে বিশ্বজনীন আবেদন এবং সকল সমাজে অশুভকে পরাজিত করে শুভর জয় নিশ্চিত করার সমুহান আদর্শ। একদা মহিষাসুর নামে একজন তার দীর্ঘদিনের সাধনার বরস্বরূপ ব্রহ্মার কাছ থেকে পুরুষের অবধ্য বর পেয়ে নিজেকে অমর মনে করেছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন উদ্ধত ও উৎপীড়নকারী। অসুরকুলের রাজা হন মহিষাসুর। তার নির্দেশে অসুরদের অত্যাচারে পৃথিবী যখন অতিষ্ঠ তখন শান্তিপুরী স্বর্গ থেকে সেই দুরাত্মা মহিষাসুর দেবতাদের বিতাড়িত করে দেয়। দেবতাদের রাজা ছিলেন ইন্দ্র। বিতাড়িত,পরাজিত অবস্থায় দেবতারা তখন দেবতা ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে ভগবান শিব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। মহিষাসুরের অত্যাচার কাহিনি শুনে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত রেগে গেলেন। সেই রাগে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করল। প্রথমে বিষ্ণু এবং পরে শিব ও ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে এক মহাতেজ নির্গত হলো। সেই সঙ্গে ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতাদের দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে সেই মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হয়। দেবতারা দেখলেন, সেই সুদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ দশদিক ব্যাপ্ত করে রয়েছে। সকল দেবতাদের তেজরাশি একত্র হয়ে একটি নারীমূর্তি আবির্ভূত হলো। কোনো নারী যে মহিষাসুরকে বধ করতে পারে সে কথা মহিষাসুরের চিন্তা বা কল্পনাতেও স্থান পায়নি। কারণ মহিষাসুর দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন যে, কোনো পুরুষ শক্তি তাকে বধ করতে পারবে না। ফলে দেবতারা সৃষ্টি করেন এক নারী শক্তি– দেবী দুর্গাকে। এই দেবী দুর্গা মহাশক্তি ধারণ করে অসুরকুল বধ করেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপূজার আরেকটি তাৎপর্য হচ্ছে, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ এবং নারী শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি।

শারদীয় দুর্গাপূজা মানেই কন্যারূপে দেবীর আগমন সপরিবারে। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবাই দেবীর পরিবারভুক্ত। পূজার কদিন সমগ্র মন্দির দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রে মুখরিত হয়ে উঠে : 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা / নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা / নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ'। ষষ্ঠী পূজার দিন দুর্গাপূজার এক মহাপর্ব। সন্ধ্যায় বিল্ববৃক্ষে বোধন আমন্ত্রণ অধিবাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ঐ সময়ে দেবীর মৃন্ময় প্রতিমায় অধিবাস করা হয়। পরদিন মহাসপ্তমী ভোরবেলায় বিল্ববৃক্ষ মূলে পূজাদি পর্ব করে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়। নবপত্রিকাকে চলিত ভাষায় কলাবৌ বলে। মূলত এতে কলা, কচু, মান, ধান, বেল, অশোক, জয়ন্তী, ডালিম ও হলুদ– এই নব পত্রিকা বা গাছ একত্রে থাকে। নবপত্রিকা স্নান করিয়ে গণেশের পাশে স্থাপন করে যথাবিধি অনুযায়ী মহাসপ্তমী পূজা শেষ হয়। পরদিন মহাষ্টমী। এদিন দেবীর জ্যোতির্ময় মূর্তি উজ্জ্বল হয়ে জগতের উপর বিশেষ কৃপা করে থাকেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস করা হয়। মহাষ্টমীর দিন দেবীর সন্ধি পূজা করা হয়। সন্ধি পূজায় ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে ১০৮টি নীল পদ্মফুল দিয়ে দেবীর পূজা করা হয়। মহাষ্টমীর শেষের একদণ্ড কাল ও মহানবমীর আরম্ভের এক দণ্ড কাল মোট এই দুইদণ্ড কাল সময়ে দেবীকে চামুণ্ডা রূপিনী কল্পনা করে পূজা করা হয়। মূলত দুই তিথির সন্ধিতে এই পূজা হয়। মহাষ্টমীর পরদিন মহানবমীর পূজা যথাবিধি অনুযায়ী করা হয়। মহানবমীর পরদিন দশমী অর্থাৎ বিজয়া দশমী। বিজয়া দশমীর দিন দেবীর মূর্তি বিসর্জনের পালা। এদিনটি মায়ের ভক্ত সন্তানের মনে বিষাদ এনে দেয়। এই কদিনের আনন্দ যেন নিমেষে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে, ঘরে ঘরে বিসর্জনের কান্না, অন্তরের সুর-বীণায় বাজে বিরহ সংগীত।

ওমা, যাইও না গো কৈলাস ভবন
তবে যদি যাও মাগো ধরি শ্রীচরণ।

লেখক: প্রুফ রিডার, বাংলাদেশ কোয়ারটার্লি

প্রবন্ধ

সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প

জাকির হোসেন চৌধুরী

একবিংশ শতাব্দীর দ্রুত বিকাশমান একটি শিল্প পর্যটন। পর্যটন শিল্প তার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক দেশের শীর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি, পর্যটন শিল্পের এক অপার সম্ভাবনাময় দেশ। এ কারণে যুগ যুগ ধরে বিদেশি পর্যটকদের কাছে চির সবুজে ঘেরা বাংলাদেশ এক স্বপ্নের দেশ হিসেবে বিবেচিত। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো এদেশে রয়েছে প্রাচীন সভ্যতার নির্দশন এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি সুন্দরবন, বাগেরহাটের ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানসহ অনেক স্থান। এ ছাড়াও সমুদ্র সৈকত এবং বনাঞ্চলের নয়নাভিরাম দৃশ্য রয়েছে পটুয়াখালীর কুয়াকাটায়। কুমিল্লার কোট বাড়িতে শালবন বিহার ছাড়াও রয়েছে: অসংখ্য ছোটোবড়ো টিলা। এখানে চোখের দৃষ্টিসীমার মধ্যে শুধুই টিলা আর নানা প্রজাতির গাছ। অন্যদিকে রয়েছে সিলেটের মৌলভীবাজারের টিলা ও চা-বাগান, রয়েছে মাধবকুণ্ড পাহাড় ও ঝর্ণা।

বিছানাকান্দি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

কার্যকরী কৌশল প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পর্যটন শিল্পের এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বর্তমানে বিশ্বের এক বৃহত্তম শিল্প পর্যটন এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে এর অবদান অপরিসীম। বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও পর্যটন শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য।

সরকার বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পর্যটন শিল্প অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতে পরিণত হবে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকার ২০১১ সাল পর্যন্ত সারাদেশে খুঁজে পাওয়া ২২শ পর্যটন কেন্দ্রকে অত্যাধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে তিন ধাপে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব কেন্দ্রের দেখাশোনা ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করবে বেসরকারি বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও পর্যটন কর্পোরেশন। ২০২১ সাল নাগাদ পর্যটনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসে পর্যটন উন্নয়নের জন্য কাউন্সিলরদের বিশেষ দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে, যা পর্যটনের প্রচারে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, ১৯৯৯ সালে পর্যটন খাত থেকে বাংলাদেশের আয় হয়েছিল ২৪৫ কোটি ১৯ লাখ টাকা এবং ২০০৮ সালে এই আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১২ কোটি ৪৫ লাখ ২০ হাজার টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের পর্যটন খাতে অপার সম্ভাবনা দেখছে বিশ্ব ভ্রমণ ও পর্যটন কাউন্সিল (ডব্লিউটিটিসি)। ২০১৫ সালে পর্যটন খাতের মোট আয়ের ৯৮ দশমিক ৩ শতাংশ ছিল স্বদেশীয় আর বৈদেশিক পর্যটক আয় মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ। যা ২০১৪ সালে ছিল যথাক্রমে ৯৭ দশমিক ৯ ও ২ দশমিক ১ শতাংশ।

গত ২৫ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে আগস্ট ২০১৭-তে মাসে ডব্লিউটিটিসি 'বাংলাদেশে ভ্রমণ এবং পর্যটন ও অর্থনৈতিক প্রভাব-২০১৬' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে ১৮৪টি দেশ এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের অপার সম্ভাবনাময় ২৪টি আঞ্চলিক পর্যটন অর্থনীতির নানা বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে পর্যটন খাতের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হলে এই খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ রপ্তানি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এক চমৎকার নজির স্থাপন হতে পারে।

গত ১০ বছরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক দৃঢ়তার পেছনে পর্যটন খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ২০১৫ সালে জিডিপি'তে এই খাতের প্রত্যক্ষ অবদান ২ দশমিক ৪ শতাংশ বা ৪০৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন টাকা এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মোট অবদান ৮০৯ দশমিক ৬ বিলিয়ন টাকা বা মোট জিডিপির ৪ দশমিক ৭ শতাংশ। যা ২০১৪ সালে ছিল ৪ দশমিক ১ শতাংশ। ২০১৬ সালের পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল জিডিপি'তে এই খাতের অবদান বেড়ে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ বা স্বদেশি মুদ্রায় ১ হাজার ৫৯৬ বিলিয়নে দাঁড়াবে আর মোট জিডিপি'তে অবদান রাখবে ৫ শতাংশ।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভ্রমণ ও পর্যটন খাতে বাংলাদেশে পরোক্ষ-প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৫০০জন নারী-পুরুষের। যা দেশের মোট কর্মসংস্থানের ২ শতাংশ। আশা করা হচ্ছে, ২০১৭ সালে আরো দেড় শতাংশ বাড়বে এবং ২০২৬ সাল নাগাদ মোট কর্মসংস্থানের ৪ শতাংশের বেশি প্রায় ৩ মিলিয়ন অর্থাৎ ২৮ লক্ষ ৯৪ হাজার নারী-পুরুষের এই খাতে কর্মসংস্থান হবে। এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হচ্ছে তরুণ-তরুণী। আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশের তরুণরা ক্রমেই পর্যটন শিল্পের দিকে আগ্রহী হচ্ছে।

পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশে ২০১৫ সালে বিনিয়োগ হয়েছে ৬ হাজার ১৬০ কোটি টাকা যা দেশের মোট বিনিয়োগের ১ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৪ সালে ছিল ৬ হাজার ৯০ কোটি যা মোট দেশজ বিনিয়োগের ১ দশমিক ৪ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ সাল নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়াবে ১৫ হাজার ১৯০ কোটি টাকা।

বৈশ্বিক অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের অবদান সম্পর্কে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালে ৭ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এই খাত থেকে যোগান এসেছে। যা বিশ্ব জিডিপি'র ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। বিশ্বের প্রতি ১১ জন কর্মজীবী মানুষের ১ জনের কর্মসংস্থান রয়েছে পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট।

সংস্থার প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেভিড স্কুসিল মনে করেন, বাংলাদেশে মূলত হোটেল ব্যবসা,ট্রাভেল এজেন্টস, এয়ারলাইন্স, যাত্রী পরিবহণ সেবা খাতসহ রেস্টুরেন্ট ও অবকাশ যাপন সেবার মাধ্যমে পর্যটন শিল্প অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

তবে বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৮ সালে ৪ লাখ ৬৭ হাজার এবং ২০০৯-২০১২ সাল নাগাদ গড়ে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বিদেশি পর্যটক বাংলাদেশে এসেছেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

অটিজম সমস্যা ও আমাদের করণীয়

পারভীন আক্তার লাভলী

মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের অসুখ হয়, তার চিকিৎসাও হয়। অন্যান্য অসুখ যেমন–জ্বর, ডায়রিয়া, মাথাব্যাথা, চোখের প্রদাহ, দাঁতে ব্যাথা ইত্যাদি রোগ হলে যে-কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারে সহজেই এবং এর চিকিৎসাও সাধারণ লোকেরা জানেন। কিন্তু অটিজম এমন একটি সমস্যা যা সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মাঝে, এমনকি অনেক শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এখনও তেমন সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। তাই অটিজম আক্রান্ত শিশুর অস্বাভাবিক আচরণকে অনেক অভিভাবক মনে করে থাকেন জিন বা ভূত-প্রেতের প্রভাবেই শিশু অস্বাভাবিক আচরণ করছে। আর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ফকির-কবিরাজ খোঁজেন ঝাড়ফুঁক-তাবিজ দিয়ে রোগ সারানোর জন্য।

ছবি আঁকছে অটিস্টিক শিশুরা

অটিজম কী? এর স্বাভাবিক উত্তর, এটি একটি স্নায়ুর বিকাশজনিত সমস্যা। জন্মের তিন বছরের মধ্যেই এর লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যায়। সাধারণত ৬ মাস বয়স থেকে অটিজমের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। এসব শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা শিশুর চেয়ে ভিন্নরকম আচরণ করে। যা দেখে তাদের আলাদা করতে পারা যায়। ছেলেমেয়ে উভয়ই অটিজমে আক্রান্ত হতে পারে, তবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের আক্রান্ত হবার হার পাঁচগুণ বেশি।

অটিজমে আক্রান্ত শিশুর আচরণে অসামঞ্জস্যতার কারণ হিসেবে যে ব্যাপারটি চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলো বাহ্যিক জগৎ (পরিবেশ) আর অন্তর্জগতের (মস্তিষ্ক) মধ্যে অস্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়া।

অটিজম আক্রান্ত শিশুর আচরণে তিনটি প্রধান অস্বাভাবিকতা দেখা যায়–

১. সামাজিক যোগাযোগের অসুবিধা

২. মৌখিক বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে যোগাযোগের অসুবিধা

৩. একই ধরনের নির্দিষ্ট কিছু কাজ বা খেলা অথবা কথার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী অনুমোদিত তথ্যের হিসাব বা বিবরণের কিছু প্রাথমিক তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

নম্বর	প্রতিবন্ধিতার ধরন	পুরুষ	মহিলা	হিজড়া	সর্বমোট
০১	অটিজম	২৩১৭৯	১৫২৮৪	৬০	৩৮৫৩০
০২	শারীরিক প্রতিবন্ধিতা	৩৭৮৬৬৮	২০৭১৯৮	৯৩৫	৫৮৬৮২৫
০৩	দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা	২৬২০৬	১৮৮৩৩	৬৩	৪৫১০৬
০৪	দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা	১০৫৩৮৬	৭৭৭৭৭	৯২	১৮৩২৬৫
০৫	বাক প্রতিবন্ধিতা	৫৪৮৯৮	৪১৪৮৮	৮৩	৯৬৪৭৯
০৬	বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা	৫৮৩১৬	৪৪৬৮৮	২০২	১০৩২১১
০৭	শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা	২১১৩৪	১৬৪০৪	৪৫	৩৭৫৮৪
০৮	শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা	৩০২৮	২৪৩২	১	৫৪৮২
০৯	অন্যান্য	০	০	০	০
১০	সেরিব্রালপালসি	৩৫৮৫২	২২৫৫০	২৫	৫৮৪৩১
১১	বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা	৯১৩৩৮	৬৬৭৩৯	১০৭	১৫৮১৯২
১২	ডাউন সিনড্রম	১৩৪৪	১০৬৫	৪	২৪১৩
মোট		৭৯৯৩৪৯	৫১৪৪৫৮	১৬১৭	১৩১৫৪৯৮

অটিস্টিক শিশুরা মনোজগতের অস্বাভাবিক বিকাশের জন্য কম কথা বলে অথবা একেবারেই বলে না। অটিজমের নির্দিষ্ট কোনো একক চিকিৎসা নেই, তবে বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের স্বাভাবিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত করা হয়। এজন্য শিশু বিশেষজ্ঞ, শিশু মনোবিদ, ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্টের সমন্বিত সেবা পেলে অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে।

অটিজম আক্রান্ত শিশুর মাঝে মেধা আছে, আছে দক্ষতাও। আবার সীমাবদ্ধতাও রয়েছে এদের মধ্যে। যথাযথ পরিচর্যা, চিকিৎসা সেবা, অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে তারাও স্বাভাবিক বিকাশপ্রাপ্ত শিশুর মতোই দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

বাংলাদেশে অটিজম ও অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অটিজম আক্রান্ত শিশু এবং প্রতিবন্ধী নারী-পুরুষ সাম্প্রতিককালে বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এদেশের বিসিএসসহ সকল চাকরিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা প্রতিবন্ধী উন্নয়নে একটি বড়ো মাইলফলক। আবার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার ব্রেইল বুক প্রদান করেছে, যা তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য অন্ধ সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য সহজ শিক্ষা পদ্ধতির ওপর বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। নারী-পুরুষ-হিজড়াসহ দেশের মোট দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১ লাখ ৮৩ হাজার ২শ ৬৫ জন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা যাতে সহজে শিক্ষা লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থায় ব্রেইল বুক ছাপানো হয়। শিক্ষার্থীরা হাতের স্পর্শেই বুঝতে পারে উঁচু-নিচু আকারের অক্ষরগুলো কোনটি কোন বর্ণ, কোনটির কোন অর্থ।

এভাবে অটিস্টিক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিতে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও অটিজম কর্মী

নারীই গড়বে বাসযোগ্য পৃথিবী

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নারী আজ সমাসীন। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ নারী বন্দিদশা ভোগ করতে করতে এগিয়ে এসেছে। কখনো নারীর বেশে আবার কখনো পুরুষের হাতে হাত রেখে। দিনে দিনে ক্রমাগত উন্নয়নের এ যাত্রা অব্যাহত রেখেছে উভয়ে। আর এর ফলে আজকের এ যুগে পদার্পণ করেছে নারী। নারী এখন আগের তুলনায় অনেক স্বাধীন। আমাদের দূরদর্শিতার অভাবে, নারীর অজ্ঞতার কারণে, সমাজে নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, নারীর অধিকার এতদিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদিও ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠালগ্নে আমাদের প্রিয় নবি (স.) নারীদের পূর্ণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমরা তার মূল্যায়ন করিনি। নারীর উন্নয়ন, নারীর দক্ষতায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন সর্বোপরি নারীকে উপযুক্ত মায়ের দায়িত্ব নিতে হবে। মায়ের সন্তান লালনপালনই হচ্ছে দেশ গঠন।

পড়াশোনায় ব্যস্ত গ্রামীণ নারীরা

প্রচলিত বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে যুগে যুগে নারীর অবমূল্যায়ন হয়েছে। এ বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে, গণ্ডির মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে নারীর উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী পুরুষ সম্প্রদায়ের সাথে হাত মিলিয়ে ধর্মান্ধের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য ভেবে সাধারণ জনগণ পিছিয়ে পড়েছে। সময়ের পরিবর্তনে শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে প্রজ্বলিত হতে থাকায় এক সময় এ ঘোর অমানিশা কাটতে শুরু করে। আজ বিশ্বের সর্বত্র ঘরে ঘরে শিক্ষার এ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আর মানুষের চোখ উন্মোচিত হচ্ছে বিস্তারিত জানতে, নিজেদেরকে যোগ্যতম আসনে অধিষ্ঠিত করতে।

তবে অতি শিক্ষিত মহলে আবার এখন জাতে ওঠার প্রবণতা লক্ষ করার মতো। তারা ভোগবিলাসিতায় নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে নারীকে পণ্যে পর্যবসিত করতে দ্বিধা করছে না। এ ভিন্ন মতাবলম্বীদের সংখ্যা আজ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রীতিনীতি বহির্ভূত এ উচ্ছৃঙ্খল জীবন অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করছে, যাকে মাদকের ছোঁয়ায় অতি দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে আদিম যুগে, কখনো বা আদিম যুগকেও হার মানাচ্ছে। বিপদের ছোঁয়া টের পেয়ে সভ্য সমাজে আজ আবার ধর্মের বাঁধনকে আঁকড়ে ধরে সভ্য সমাজে ফিরে আসার জোর প্রচারণা চলছে বিশ্বব্যাপী। এক্ষেত্রে আরো জোরালো পদক্ষেপে বিশ্বের সভ্য সমাজ এগিয়ে না আসলে সারাবিশ্বই উচ্ছন্নে যাবে, আগামী প্রজন্ম আবদ্ধ হবে কঠিন এক নষ্টের বেড়াজালে– যা নিঃশেষ করবে মানব-সমাজকে।

আধুনিকতার নামে, নারীর উন্নয়নের নামে, নারীকে পণ্য বানানোর খেলায় যারা ঘোমটা পরে নাচছে তাদের মুখোশ উন্মোচনের সময় এসেছে। অসামাজিক, অসভ্য, অশ্লীল কর্মকাণ্ডে আজ বিশ্বের এক ক্ষুদ্রতম অংশ জড়িত থাকলেও মাদকের আকর্ষণে এর দ্রুত বিস্তার হচ্ছে। সাময়িক প্রাপ্তির লোভে অসভ্যভাবে নেচে, গেয়ে, শরীর দোলায়ে যারা আজ নিজেদেরকে ধন্য মনে করছে তারা বিশ্বের নারী সমাজকে যে পণ্যে পর্যবসিত করছে সেদিকে তাদের কোনো নজর নেই। ওদের জগৎই আলাদা। অসুবিধা হতো না যদি ভিন্ন একটি জগতে থাকত ওদের বসবাস, যদি ওদের প্রভাবে অন্যরা প্রভাবিত না হতো। কিন্তু একথা বলা বা চিন্তা করাতো বৃথা। তাই সকলকে নিয়ে ভাবতে হবে বিশ্বকে শান্তিময় করার জন্য। নারীর উন্নয়নে বাস্তবসম্মত চিন্তা করতে হবে, যথার্থ উপায় খুঁজে বের করতে হবে বিশ্বকে।

নারীর ক্ষমতায়নের কথা ভাবার আগে নারীকে উপযুক্ত স্থানে অধিষ্ঠিত করতে চাই তার দক্ষতায়ন। আর এজন্য শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা, মোটকথা সার্বিক গুণাগুণ বিচারে যার যার মতো উপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত করতে পারলেই শান্তিময় পৃথিবীর সন্ধান পাওয়ার আশা করা যায়। বিশ্বে আজ যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তা দু'মুঠো খাবারের জন্য নয়। একে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় কে জানে। আগামী দিনে আর নারী উন্নয়ন বা পুরুষ উন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে এমনটি মনে হয় না। আমাদের সামনে যে বিষয়টি উঁকি মারছে তা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি। সুস্থ স্বাভাবিক না থাকলে মানুষের চাহিদার কোনো পূর্ণতা থাকে না। তাই অস্থির মনকে নিয়ে শান্তিময় বিশ্ব চিন্তা করা বৃথা। তাই নারীর উন্নয়নের সাথে সাথে দক্ষতায়ন এবং সবশেষে ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রাধান্য পাবে।

পরিকল্পনা হতে হবে বিশ্বব্যাপী। মাদকের অপব্যবহার রোধ করতে হবে। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী চাই। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। সার্বিক চিকিৎসা সুবিধা ধনী-গরিব সকলের জন্য নিশ্চিত করতে হবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী একযোগে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সকলকে ধ্বংসাত্মক চিন্তা-চেতনা মাথা থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। এসবই মনে হয় অলীক কল্পনা, অবাস্তব। কিন্তু উপায় কী ? নতুন প্রজন্মের জন্য বাস উপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের সঠিক সুন্দর পন্থা কী হতে পারে?

বসতে হবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে। নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন বাসযোগ্য পৃথিবীর আশায়। আরো একবার ভেবে দেখবে কি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, নিরালায়-নির্জনে, সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় ? সকলের চাওয়া এক সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী।

লেখক : সমাজ সচেতনতার কলাম লেখক

নারীর অগ্রযাত্রায় প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা

জান্নাতে রোজী

আমাদের দেশের নারী উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই– দেশে এখন নারী ক্ষমতায়নের স্বর্ণযুগ চলছে। নারী এখন ঘরের গণ্ডি ছেড়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে ব্যাপকহারে। ঘর-গৃহস্থালি থেকে শুরু করে চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশল, আইন, প্রশাসনের উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর, নার্সিং, শিক্ষকতা, খেলাধুলা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ পেশাদারীর সকল স্তর এখন নারীর পদচারণায় মুখরিত। দেশে, দেশের বাইরে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান এখন অত্যন্ত শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। নারীর এ সাফল্যজনক ক্ষমতায়নে সারাবিশ্ব অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে বাংলাদেশকে। তারা বাংলাদেশকে নারীর ক্ষমতায়নের রোল মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক

বান্দরবান জেলার লামায় জয়িতা পুরস্কারপ্রাপ্ত কয়েকজন সফল কর্মজীবী নারী –ফাইল ছবি

ওবামা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, জার্মান চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল, ভারতের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করতে গিয়ে বাংলাদেশের নারী নেতৃত্বের প্রসঙ্গ টেনে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত 'ইন্টিগ্রেটিং এ জেন্ডার পারসপেকটিভ ইনটু দ্য ওয়ার্ক অব দ্য ইউনাইটেড নেশনস মিলিটারি ইন পিস কিপিং অপারেশন' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের বক্তারা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর সামনে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে এবং নারী নেতৃত্বে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে বলে দাবি করেন।

আর এসব সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের নারীবান্ধব নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে বর্তমান সরকার। নারী শিক্ষার প্রসারে শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প, ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। নারীর নিরাপত্তায় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন, আবাসন ও অন্যান্য সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। নিরাপদ যাতায়াতের জন্য কিছু কিছু রোডে মহিলা বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। কর্মজীবী নারীদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করার জন্য সারাদেশে মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। সরকার দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় পর্যায়ক্রমে মহিলা হোস্টেল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এরমধ্যে ২০টি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে, আরো ৬০টি প্রকল্পের অনুমোদন কার্যক্রম চলছে। নারীদের নিরাপত্তায় হেল্পলাইন (১০৯) চালু করা হয়েছে, যেখানে কল করে যে-কোনো সময় সাহায্য চাওয়া যায়। চালু আছে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ এবং টেকসই উন্নয়নের (SDG) ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত কর্মসূচি দেশে নারীদের দৃঢ় সামাজিক অবস্থানে নিয়ে গেছে। নারী উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ২০১১ সালে জয়িতা ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশব্যাপী ১২ হাজার ৯৫৬টি পল্লি মাতৃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশুর যত্নসহ যাবতীয় বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। সন্তানের পরিচয়ে সকলক্ষেত্রে মায়ের নাম অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক করা হয়েছে। বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এমন নারী উন্নয়নের ধারায় দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন গুটিকয়েক নরাধম নারীর অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে তৎপরতা চালাচ্ছে।

সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার আসানবাড়ি গ্রামের মেয়ে রূপা। একটু একটু করে জীবনটা গড়ছিল সে। পড়াশোনার খরচ জোগাতে টিউশনি করেছে, পরিবারে ভরণপোষণের জন্য পোশাক কারখানায় কাজ করেছে। তবুও পিছু হটেনি রূপা। মেধাবী রূপা স্নাতকোত্তর শেষ করে ঢাকার আইডিয়াল ল কলেজে এলএলবি'তে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ নিয়েছিল শেরপুরের একটি বহুজাতিক কোম্পানির প্রমোশনাল ডিভিশনে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ শেষে বগুড়া থেকে ময়মনসিংহগামী ছোঁয়া পরিবহণের একটি বাসে কর্মস্থলে ফেরার পথে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হন। থেমে যায় সংগ্রামী রূপার জীবন ও স্বপ্ন। সম্প্রতি কর্মজীবী নারী শিক্ষার্থীর ওপর সহিংসতার আরো একাধিক ঘটনা ঘটেছে। নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এসব অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। তাই তো বর্তমান সরকার এসব অপরাধের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে দৃঢ়সংকল্প। রূপা হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়েছে ইতোমধ্যে। রূপা হত্যাকারীদের পক্ষে মামলায় না লড়তে আইনজীবী সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

এখন আমরা যদি তৎপর না হই, সচেতন না হই তাহলে সরকারের একার পক্ষে এসব জঘন্য অপরাধের হাত থেকে রূপার মতো মেয়েদের বাঁচাতে পারব না। আমাদের সকলের উচিত নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকল ক্ষেত্রে প্রশাসনকে সাহায্য করা।

বিদেশি চ্যানেলের অনুকরণে আমাদের যুবসমাজ আজ বিপথগামী। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে, বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্রে অশালীন পোশাক, অশোভন অঙ্গভঙ্গি রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এসেছে। পরিবার হচ্ছে প্রথম ও সবচেয়ে বড়ো শিক্ষালয়। সেখানে প্রতিটি সন্তানকে যদি আমরা নৈতিকতার শিক্ষা, ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা এবং যে মায়ের গর্ভে জন্ম সে 'মা' জাতির প্রতি সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার শিক্ষা সঠিকভাবে দিতে পারি, তাহলে সমাজ থেকে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে কমে যাবে।

তাই আসুন এ রকম নৃশংস, জঘন্য ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য নিজেরা সচেতন হই, অন্যদের সচেতন করি এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি সমাজের এসব অপরাধের বিরুদ্ধে। সরকারের নানাবিধ প্রচেষ্টার পাশাপাশি কেবল এবং কেবলমাত্র সম্মিলিত সামাজিক সচেতনতাই পারে নারীর অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করতে।

লেখক : সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ এবং ফটোফিচার: ফরিদ হোসেন

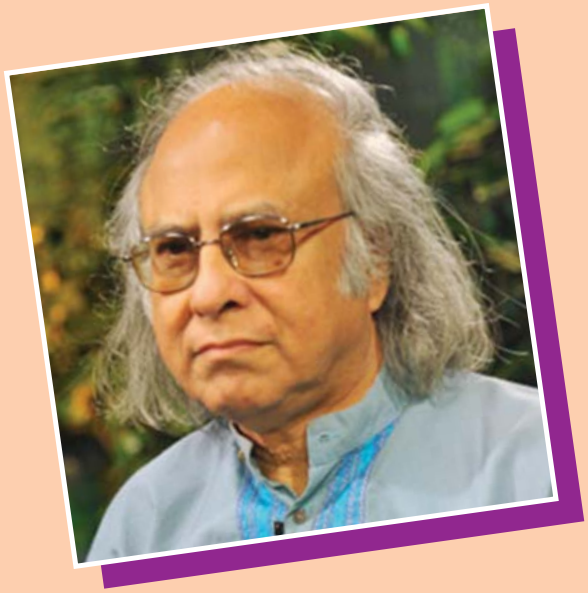

একান্ত সাক্ষাৎকার

অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ

[ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ ১৯৪৩ সালে সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আসাম আইন পরিষদের সদস্য ও কলেজের অধ্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে ১৯৬১ সালে বিএ অনার্স, ১৯৬২ সালে এম এ ডিগ্রি এবং পরবর্তীতে ইউনির্ভাসিটি স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেলের সদস্য ছিলেন। তিনি ২৩ বছর পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স-এ কাজ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এ গবেষক হিসেবে এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সাল থেকে তিনি পল্লি কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকস-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তিনি ২০০৯ সালে একুশে পদক এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর ৩৫টির অধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।]

প্রশ্ন : একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনি বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্যকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উত্তর : বর্তমান সরকার প্রায় ৯ বছর ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে। এই সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং তা আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই সময়ে বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে ছিল এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ৭ দশমিক ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩ শতাংশ। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বর্তমানে ১ হাজার ৬শ ৬৮ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে জনশক্তি রপ্তানি করা হয় সেইসব দেশে অভ্যন্তরীণ সংকট থাকায় এ খাতের আয় কমে গেছে। ফলে পণ্য ও সেবা রপ্তানি খাতের আয় প্রত্যাশা মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তারপরও বাংলাদেশ যেভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে তা বিশ্বের খুব কম দেশের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষের আশাবাদ খুবই বেড়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্যালপ পল ২০১৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জরিপ কার্য পরিচালনা করে। তাদের সেই জরিপে জনগণের আশাবাদের ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান বাংলাদেশের পরে। অন্যান্য দেশ আরো পিছিয়ে আছে। আমরা যদি এই সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সামাজিক সেক্টরের সাফল্যকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর : সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো কোনো সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে। শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। পুষ্টিহীনতা কমেছে। সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ ভালো অগ্রগতি সাধন করেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। মেয়েশিশুদের বিদ্যালয় গমনের হার আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বেড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার হারও কমেছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখন ছেলেদের চেয়েও বেশি। শিক্ষাবিস্তারের ফলে বাল্যবিবাহও কমে গেছে। মোটকথা, আমরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছি। তবে এখানেই আমাদের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে।

প্রশ্ন : টেকসই অর্থনীতির জন্য জনসক্ষমতা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

উত্তর: আগামীতে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে আমাদের জনসক্ষমতা বাড়াতে হবে। জনসক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছে। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে প্রচেষ্টা আছে। এমনকি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নীতিও আছে। শিক্ষা নীতিও আছে। এগুলো অত্যন্ত যুগোপযোগী। তবে এসব নীতি বাস্তবায়নে আরো তৎপর হতে হবে।

প্রশ্ন : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ বিকাশ একটি পূর্বশর্ত। এ ক্ষেত্রে আপনার মূল্যায়ন কী?

উত্তর : বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য একটি উপযোগী স্থান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু বিনিয়োগ তথা শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য উপযোগী জমির অভাব রয়েছে। ভূমির সংকট নিরসনে সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে কার্যকর 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস'-এর ব্যবস্থা করা হবে। অন্তত ১৬টি প্রতিষ্ঠান এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে তাদের শাখা স্থাপন করবে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। তবে বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে জ্বালানি ও অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি বন্দর ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করাও জরুরি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে কৃষি খাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা কেমন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবেই একটি কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষিতে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। মাছ, শাকসবজির উৎপাদন অনেক বেড়েছে। চাষকৃত মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে চতুর্থ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের জিডিপি'তে কৃষিপণ্য, মাছ, পশু ইত্যাদি মিলিয়ে কৃষি খাতের অবদান বর্তমানে ১৫ শতাংশ। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের সামগ্রিক অবদান হ্রাস পেলেও উৎপাদন তো বেড়েছে। কৃষি খাতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

প্রশ্ন : গ্রামীণ অর্থনীতিতে শিল্পায়নের একটি প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। এই বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ কৃষি নির্ভরতা কাটিয়ে শিল্পায়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে একধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এখন প্রচুর অর্থ প্রবিষ্ট হচ্ছে। যারা বিদেশে কাজ করছে, তারা যে রেমিটেন্স প্রেরণ করছে তা গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামে এখন অনেকেই ছোটো ছোটো শিল্পকারখানা গড়ে তুলছেন। গ্রামের মানুষ কৃষিকাজের পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির চেষ্টা করছে। শুরু হয়েছে কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমও।

অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে গ্রামে উৎপাদিত পণ্য দ্রুত শহরে চলে আসছে এবং গ্রামের মানুষ পণ্যের সঠিক দাম পাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরো বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার। গ্রামের মানুষের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি।

প্রশ্ন : টেকসই উন্নয়নের জন্য সামাজিক ন্যায্যতা ও সম্পদের সুষম বণ্টন কতটুকু জরুরি, বলবেন কি?

উত্তর : দরিদ্র মানুষ যদি প্রবৃদ্ধির সুফল ভোগ করতে না পারে সেই প্রবৃদ্ধি কখনোই টেকসই হতে পারে না। সরকার নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সাধারণ দরিদ্র মানুষ ন্যায্যতার ভিত্তিতে ভোগ করতে পারে। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এর (এসডিজি) একটি মূল লক্ষ্যই হচ্ছে উন্নয়নের সুফল থেকে কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। এগিয়ে যেতে হবে কিন্তু কাউকেই পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। সমাজে যারা প্রতিবন্ধী আছেন, যারা চরের মানুষ আছেন, যারা নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এসব মানুষের উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। নারী কৃষি শ্রমিক এদের কথাও ভাবতে হবে। এসব অবহেলিত মানুষের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে তিনটি জিনিস ঘটবে। প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পাবে। তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধিতে এরা বেশি পরিমাণে অবদান রাখতে পারবে।

প্রশ্ন : গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে আপনি বিভিন্ন সময় কথা বলেছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা কেমন বলে মনে করেন?

উত্তর : আগেই বলেছি বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শুধু কৃষি নয়, কৃষির বাইরেও প্রচুর উন্নতি হয়েছে। নানাভাবে উন্নয়নের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সরকার গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা দিয়ে চলেছেন। কৃষির বাইরে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টিতে সরকার নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছে। কৃষি ও পল্লি ঋণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্যোক্তা হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। কৃষির বাইরে ছোটো ছোটো শিল্প হচ্ছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সামাজিক পুঁজির ব্যবহার বাড়ছে। এই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আরো গতিশীল এবং স্থিতিশীল করতে নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট প্রয়োজন। সরকার সেই সাপোর্ট দিয়ে চলেছে।

প্রশ্ন : ইনফর্মাল সেক্টর আমাদের দেশে একটি বড়ো অর্থনৈতিক খাত। কিন্তু এই খাতের অবদানকে জাতীয় অর্থনীতিতে যুক্ত করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : ইনফর্মাল সেক্টরের অবদান জিডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। কারণ এগুলোর তো কোনো খবরই থাকে না। আরো একটি বিষয় হলো, বাড়িতে নারীরা যে কাজ করে তাও জিডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। এটা জিডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা গেলে জিডিপি অনেক বেড়ে যাবে। জিডিপি'র আকার যদি সঠিকভাবে হিসেব করা যেত তাহলে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার জন্য তিনটি ক্রাইটেরিয়া আছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সামাজিক সূচক, আর একটি হচ্ছে ঝুঁকি সূচক এবং অন্যটি হচ্ছে আয় সূচক।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার রয়েছে। উন্নয়নের জন্য এ বাজারের ভোক্তা চাহিদা বৃদ্ধি কতটা সহায়ক?

উত্তর : বাংলাদেশের রয়েছে ১৬ কোটি মানুষের এক বিশাল বাজার। অভ্যন্তরীণভাবে মানুষের ভোগ চাহিদা এবং ভোগ ব্যয়ের সামর্থ্য আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং সামর্থ্যের পরিচায়ক। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। আমরা যেসব পণ্য ও সেবা উৎপাদন করি তা আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি স্থানীয় বাজারকেও বিবেচনায় রেখে বাজারজাত করতে হবে। বাংলাদেশে প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স আসে তার মাত্র ২৫ শতাংশ উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ হয়। অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অর্থ ভোগ ব্যয়ে কাজে লাগানো হয়। অবশ্য এরও একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। কারণ মানুষের ভোগ চাহিদা বৃদ্ধি পেলে পণ্যের জোগানও বাড়ে। ফলে পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থা অতিক্রম করছে। এই অবস্থায় মানবসম্পদ উন্নয়নে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। বাংলাদেশে তরুণ শ্রম শক্তির সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ কোটি। এই যুবসমাজকে উৎপাদনশীল কাজে সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য তাদের শিক্ষিত এবং উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা ব্যবহারে সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এদের প্রশিক্ষিত করা এবং তাদের মাঝে মানবিক গুণাবলির বিকাশ করা গেলে তাদের উৎপাদনশীলতাকে সর্বোত্তম ব্যবহার করা যাবে। এদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাটা সবচেয়ে জরুরি। চাকরি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান হতে পারে। চাকরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা সীমিত। তাই আত্ম-কর্মসংস্থানের দিকে বেশি মনোযোগী হতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলো হচ্ছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য। এই তিনটি বিষয় নিশ্চিত করা গেলে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হবে। আমরা পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে এই তিনটি বিষয় নিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের চেষ্টা করে চলছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছেন তাদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন নীতি আছে, সেই নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন : ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নে কতটা অবদান রাখে– এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর : ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে অনেকগুলো গবেষণা হয়েছে। এক্ষেত্রে অন্তত তিনটি গবেষণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরমধ্যে একটি গবেষণা আমি নিজে করেছি ২০০৬ সালে। সারাদেশ থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে এই গবেষণা করা হয়েছিল। সেই গবেষণায় আমি দেখেছিলাম, দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে তাদের মাত্র ৭ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে পেরেছিল। বাকি ৯৩ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে থেকে গেছে। এই গবেষণায় তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যারা অন্তত ৪ বছর ধরে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার করছে। সম্প্রতি যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেছে তাদের এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অন্য গবেষণাটি করে ওয়াশিংটনভিত্তিক গ্লোবাল মাইক্রো ক্রেডিট ক্যাম্পেইন নামে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কে ধারণ করে এই গবেষণা পরিচালিত হয়। তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে বাংলাদেশে বর্ণিত সময়ে ২ মিলিয়ন পরিবার দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠেছে। এই ফাইন্ডিংকে তারা পৃথিবীব্যাপী ফলাও করে প্রচার করে। কিন্তু যেটা বলা হয়নি তাহলো, ক্ষুদ্র ঋণ নিয়েছে প্রায় ২৩/২৪ মিলিয়ন পরিবার যারা দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ মাত্র ৯ দশমিক ৪ শতাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে পেরেছিল। আমি পেয়েছিলাম ৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠেছে আর তারা পেয়েছে ৯ দশমিক ৪ শতাংশ। এই দুই গবেষণার মধ্যে অনেকটাই মিল আছে। আর একটি গবেষণা করা হয়েছে অভিজিৎ ব্যানার্জির নেতৃত্বে হার্ভার্ডের একটি প্রতিষ্ঠান। তারা ৭টি দেশে এই গবেষণা কার্য পরিচালনা করে। দেশগুলো হচ্ছে– ভারত, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপিন্স, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, মরক্কো, ইথিওপিয়া এবং মেক্সিকো। তাদের গবেষণার মূল বিষয় ছিল ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে সাধারণ দরিদ্র মানুষের কেমন অগ্রগতি হয়। এই গবেষণায় দেখা গেছে, ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে দরিদ্র মানুষের আয় তেমন একটা বাড়েনি। আয় কিছুটা বাড়লেও তারা দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে পারেনি। এছাড়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ বাড়েনি। তারা ইতিবাচক যেটা বলেছে তাহলো, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের হাতে কিছু টাকা এসেছে। তারা কিছু একটা কাজ করতে পারে। আমি নিজে আরো একটি বিষয় লক্ষ করেছি তাহলো, যারা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠেছে তাদের সেই অবস্থানও টেকসই নয়। যে-কোনো সময় তারা পড়ে যেতে পারে। ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে দরিদ্র মানুষের তেমন কোনো সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না। আর সম্পদ সৃষ্টি না হলে তো দারিদ্র্য বিমোচন টেকসই হবে না। কাজেই বলা যেতে পারে, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা নেই।

প্রশ্ন : বাংলাদেশকে এখন 'উন্নয়নের রোল মডেল' বলা হয়। কী কারণে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল বলা হয়?

উত্তর : বর্তমান সরকারের অধীনে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে। শুধু উন্নয়ন ঘটেছে এটাই নয়, এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। দারিদ্র্য কমে এসেছে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে দারিদ্র্য আরো কমাতে হবে। তবে এ পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সরকার যে সাফল্য দেখিয়েছে তা বিস্ময়কর। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। এই অবস্থান আমাদের ধরে রাখতে হবে এবং আরো গতিশীল করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রতিবেদন : এম এ খালেক, উপমহাব্যবস্থাপক, বিডিবিএল, মতিঝিল, ঢাকা

আব্দুল জব্বার

বাংলা গানের কিংবদন্তির প্রয়াণ

সুলতানা বেগম

আব্দুল জব্বার বাংলাদেশের সংগীত জগতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল নাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কিংবদন্তি, এক কণ্ঠসৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। এদেশের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি জনপদের প্রিয় গায়ক তিনি। তিনি ছিলেন মূলত আধুনিক গানের শিল্পী। কিন্তু তিনি দেশাত্মবোধক, গণসংগীত, লোকগীতি এবং চলচ্চিত্রের অসংখ্য গান গেয়ে সংগীত প্রেমীদের মন জয় করেছেন। গুণী এই শিল্পী ৩০শে আগস্ট ২০১৭ না ফেরার দেশে চলে গেছেন। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত গণ-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে যাঁরা আধুনিক বাংলা গানকে সমৃদ্ধি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আব্দুল জব্বার অন্যতম। আবেগের সঙ্গে দরদের মিশ্রণে তাঁর প্রতিটি গান হয়ে উঠেছে আবেশ ছড়ানো। এজন্য গায়ক নয়, আব্দুল জব্বার হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন মহান কণ্ঠসৈনিক।

কিংবদন্তি এই কণ্ঠসৈনিক ১৯৩৮ সালের ৭ই নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁর শৈশব-কৈশোর কাটে। মায়ের অনুপ্রেরণায় ছোটোবেলা থেকেই গানের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন আব্দুল জব্বার। তিনি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন কুষ্টিয়ায় ওস্তাদ মোহাম্মদ ওসমানের কাছে গান শেখেন। এরপর মকসেদ আলী সাঁই ও লুৎফুল হকের কাছে গানের তালিম নেন। এছাড়া তিনি ওপার বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী শিবু কুমার চ্যাটার্জির কাছেও তালিম নেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৭ সালে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে তাঁর কণ্ঠে নজরুল সংগীত 'ঘুমিয়ে আছ বুলবুলি গো মদিনার গুলবাগে' গানটি শুনে ঢাকা বেতারের গীতিকার আজিজুর রহমান তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ১৯৫৮ সাল থেকে তৎকালীন পাকিস্তান বেতারের তালিকাভুক্ত সংগীত শিল্পী হিসেবে যাত্রা শুরু করেন আব্দুল জব্বার। বেতারেই তাঁর কণ্ঠে নজরুল সংগীত শুনে সংগীত পরিচালক রবিন ঘোষ তাঁকে চলচ্চিত্রে প্লেব্যাকের প্রস্তাব দেন। ১৯৬২ সালে এহতেশামুল হক পরিচালিত ও রবিন ঘোষ সুরারোপিত *নতুন সুর* চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্লেব্যাক শিল্পী হিসেবে তাঁর অভিষেক হয়। এর ২ বছর পর বিটিভিতেও নিয়মিত গান গাইতে শুরু করেন আব্দুল জব্বার।

নতুন সুর চলচ্চিত্রে প্লেব্যাকের পর থেকে আব্দুল জব্বার এদেশের অসংখ্য চলচ্চিত্রের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তিনি যেসব ছবিতে প্লেব্যাক করেছেন সেগুলো হলো– *উলঝন* (১৯৬৪), *সঙ্গম* (১৯৬৪), *নবাব সিরাজ উদ্দৌলা* (১৯৬৭), *এতটুকু আশা* (১৯৬৮), *ঢেউয়ের পর ঢেউ* (১৯৬৮), *ভানুমতি* (১৯৬৯), *ক খ গ ঘ ঙ* (১৯৭০), *পীচ ঢালা পথ* (১৯৭০), *দীপ নেভে নাই* (১৯৭০), *বিনিময়* (১৯৭০), *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) *নাচের পুতুল* (১৯৭১), *মানুষের মন* (১৯৭২), *স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা* (১৯৭৩), *ঝড়ের পাখি* (১৯৭৩), *আলোর মিছিল* (১৯৭৪), *সূর্যগ্রহণ* (১৯৭৬), *তুফান* (১৯৭৮), *অঙ্গার* (১৯৭৮), *সারেং বউ* (১৯৭৮), *সখী তুমি কার* (১৯৮০), *কলমি লতা* (১৯৮১)। আব্দুল জব্বার অসংখ্য আধুনিক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। যা সংগীত প্রেমীদের মন জয় করেছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও স্বীকৃতি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য গানগুলো হলো– তুমি কি দেখেছ কভু, সালাম সালাম হাজার সালাম, জয় বাংলা বাংলার জয়, ওরে নীল দরিয়া, পীচ ঢালা এই পথটারে, এক বুক জ্বালা নিয়ে বন্ধু তুমি, বন্ধু তুমি শত্রু তুমি, বিদায় দাওগো বন্ধু তোমরা, তুমি আছ সবই আছে, আমিতো বন্ধু মাতাল নই, তারা ভরা রাতে। ২০০৬ সালের মার্চ মাসে আধুনিক বাংলা গান নিয়ে বিবিসি'র জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ২০টি গানের তালিকায় স্থান পায়– তুমি কি দেখেছ কভু, সালাম সালাম হাজার সালাম এবং জয় বাংলা বাংলার জয় গান ৩টি। এছাড়া ২০১৭ সালে আব্দুল জব্বারের প্রথম মৌলিক গানের অ্যালবাম 'কোথায় আমার নীল দরিয়া' মুক্তি পায়। অ্যালবামটির গীতিকার মো. আমিরুল ইসলাম এবং সুরকার গোলাম সারোয়ার।

আব্দুল জব্বারের দেশের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ আর ভালোবাসা। তিনি ছিলেন একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে আগরতলায় চলে যান। সেখানে দেখা হয় আপেল মাহমুদের সঙ্গে। পরে তারা মুজিবনগরে পৌঁছে যোগ দেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ও প্রেরণা জোগাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সালাম সালাম হাজার সালাম, জয় বাংলা বাংলার জয়সহ অসংখ্য গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তাঁর গানে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া যুদ্ধের সময় তিনি প্রখ্যাত ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মুম্বাইয়ের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরিতে কাজ করেন। সেসময় কলকাতাতে অবস্থিত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ঘুরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গণসংগীত পরিবেশন করেছেন। গণসংগীত গেয়ে প্রাপ্ত ১২ লাখ রুপি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ তহবিলে দান করেছিলেন। তাঁর এই অবদান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আব্দুল জব্বার ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি বঙ্গবন্ধুকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। বঙ্গবন্ধুও তাকে সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠসৈনিক আব্দুল জব্বার সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং সম্মাননা। তিনি ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক', ১৯৮০ সালে 'একুশে পদক', ১৯৯৬ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার', ২০০৩ সালে 'বাচসাস পুরস্কার', ২০১১ সালে 'সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড– আজীবন সম্মাননা' এবং 'জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কারে' ভূষিত হন। সংগীতাঙ্গনে তিনি নিজেই শুধু গায়ক হিসেবে ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী শাহীন জব্বার একজন গীতিকার এবং ছেলে মিথুন জব্বার সংগীত শিল্পী।

আব্দুল জব্বার আধুনিক বাংলা গানের জগতে অদ্বিতীয়। তিনি বাংলা গানের ঐশ্বরিক কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মতো এত বড়ো মাপের গায়ককে হারিয়ে সংগীতাঙ্গনে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আদ্যোপান্ত একজন দেশপ্রেমিক শিল্পী ছিলেন এবং আজীবন নিজ দেশ ও সংগীতের প্রতি বিশ্বাস বজায় রেখেছিলেন। কোনো লোভ, প্রলোভন তাঁকে টলাতে পারেনি। নিজের অবস্থানে ছিলেন আপোশহীন। দেশের মানুষও তাঁকে সর্বোচ্চ ভালোবাসার স্থানে রেখেছিলেন। তাঁর কালজয়ী গানসমূহ মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন বাঙালিদের শক্তি সঞ্চার করেছে, তেমনি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম জাতিকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি যুগের পর যুগ বেঁচে থাকবেন তাঁর কালজয়ী গানের মধ্য দিয়ে।

লেখক : সিনিয়র সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ

প্রবন্ধ

১৬ই অক্টোবর : বিশ্ব খাদ্য দিবস

খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশের সাফল্য

শারমিন সুলতানা শান্তা

১৯৪৫ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা'। ১৯৭৯ সালে এই সংস্থার ২০তম সাধারণ সভায় হাঙ্গেরির তৎকালীন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. পল রোমানি ১৬ই অক্টোবর বিশ্বব্যাপী 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' পালনের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮১ সাল থেকে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রতিষ্ঠার দিনটিতে পালিত হয়ে আসছে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস'। খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং কৃষি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৫০টির বেশি দেশে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়। বিশ্ব খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য: Change the future of migration. Invest in food security and rural development.

মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে 'খাদ্য' অন্যতম। গত কয়েক দশকে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন, বন্যা, খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এখন খাদ্যের সঙ্গে শুধু 'নিরাপত্তা' বিষয়টি নয়, 'নিশ্চিত' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাষযোগ্য জমি সংরক্ষণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম বনায়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশ একযোগে কাজ করে চলেছে। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন অনুযায়ী, 'খাদ্য নিরাপত্তা তখনই আছে বলে মনে করা হয় যখন সকল নাগরিকের সব সময়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা থাকে। যা তাদের সক্রিয় ও সুস্থ জীবন নিশ্চিতকরণের জন্য সঠিক পরিমাণ খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে।'

দেশের মোট খাদ্যশস্যের চাহিদা কত তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া মুশকিল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩ কোটি ৪২ লাখ ৬০ হাজার টন চাল ও ১০ লাখ ৩৯ হাজার টন গম উৎপাদন হয়। সেসময় দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যশস্যের চাহিদা সাড়ে ৫শ গ্রাম ধরা হয়। এ হিসাবে ১৫ কোটি লোকসংখ্যার জন্য বার্ষিক চাল ও গমের চাহিদা ৩ কোটি ১ লাখ সাড়ে ১২ হাজার টন। সেখানে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকার কথা বলা হয়। ২০১৫-১৬ সালে চাল উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বনির্ভর। চাল ও মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়। বিগত ৮ বছরে মোট দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় ২৯২৯.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে খাদ্যশস্যের আনুপাতিক উৎপাদন পরিস্থিতি– বোরো ৫৩%, আমন ৩৭%, আউশ ৬% এবং গম ৪%।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার অধিক পরিমাণ আগাম মজুত সংরক্ষণ করছে। ২০০৮ সালে খাদ্যগুদামের ধারণক্ষমতা ছিল ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বিগত ৮ বছরে নির্মিত নতুন খাদ্যগুদাম ১৪৪টি। বর্তমানে সরকারি গুদামের ধারণক্ষমতা ২০.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। এ ধারণক্ষমতা ২০৩০ সাল নাগাদ ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লক্ষ হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে কার্ডের মাধ্যমে ১০ টাকা কেজিতে চাল বিতরণ কার্যক্রম ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বল্পমূল্যে খোলাবাজারে ওএমএস খাতে বিক্রিত চাল ও গমের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫০২ মেট্রিক টন ও ১০ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৫৪ মেট্রিক টন। ২০১০ সালে সরকার প্রথমবারের মতো দেশে সুলভমূল্যে কার্ডের প্রচলন করে কার্ডধারী প্রায় ৭৭ লক্ষ পরিবারের মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের কর্মসূচি চালু করেছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' কার্যকর করেছে সরকার। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ'। বর্তমানে মানুষ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে অনেক সচেতন।

উন্নতমানের বীজ হচ্ছে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য একটি অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। শুধুমাত্র ভালো বীজই এককভাবে ফসলের উৎপাদন ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। চাহিদামাফিক মানসম্মত বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। মানসম্মত বীজের কিছু অংশ ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বিএডিসি মানসম্মত বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ'। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের ২য় পর্যায় (জুলাই ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত) শীর্ষক একটি প্রকল্প ১৭২ কোটি ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে দেশব্যাপী চালু হয়েছে। পাওয়ার টিলার, পাওয়ার ট্রেসর, কম্বাইন হারভেস্টার (বড়ো), কম্বাইন হারভেস্টার (মাঝারি), রাইস ট্রান্সপ্লান্টর, ফুট পাম্প ইত্যাদি যন্ত্রের ওপর ৩০% হারে ভরতুকি প্রদান করা হচ্ছে। আকৃতিতে ছোটো জমি চাষ, ফসল কাটা, খোসা থেকে দানা আলাদা করাসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কম্বাইন হারভেস্টার। তাছাড়া নির্দিষ্ট স্থানে বীজ বপনের জন্য রয়েছে সিডড্রিল। বীজ বপন, সার প্রয়োগ ও কীটনাশক ছিটানোর জন্য আছে ব্রডকাস্ট সিডার, শস্য কাটার জন্য আছে পাওয়ার রিপার মেশিন, ফসল ঝেড়ে পরিষ্কার বীজ পেতে রয়েছে ইউনার মেশিন ইত্যাদি। কৃষি ক্ষেত্রে বড়ো চ্যালেঞ্জ 'শ্রমিক সংকট' নিরসনে প্রযুক্তি ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। উৎপাদন খরচ কমানো এবং আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ'- এর বিকল্প নেই।

এখন বাঙালিদের খাদ্যাভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভাতের পরিবর্তে এখন অনেকেই রুটি, গম, ভুট্টা, ওটস, সবজি, সালাদ, শিম, আলু ইত্যাদি খাচ্ছে। ফলে চালের চাহিদা কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে।

খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। চাল, সবুজ শাকসবজি, ফল, প্রক্রিয়াজাত খাবার, হিমায়িত মাছ ইত্যাদি রপ্তানি করে বাংলাদেশ অর্জন করেছে অসংখ্য প্রশংসা। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই অভাবনীয় সাফল্যের দাবিদার বর্তমান সরকার।

লেখক : কপি হোল্ডার, সচিত্র বাংলাদেশ

গগন যখন গেরিলা

মানজুর মুহাম্মদ

শালু খিলখিল করে হাসতে থাকল। শাপলাপুরের বুক চিরে চলে যাওয়া খরস্রোতা নদীটির নাম কাজলা। নদীটি গভীর। বৈশাখ মাসেও মাঝারি আকৃতির স্টিমার চলে।

শালু শাপলাপুরের চাষি কলিম মিয়ার মেয়ে। তারা এক ভাই, এক বোন। শাপলাপুরের মানুষ খুব দরিদ্র। শাপলা বিলের জন্য এ গ্রামটি আশপাশের দশ গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত। এ বিলে প্রচুর লাল শাপলা জন্মায়। লাল শাপলা সবজি হিসেবে অত্যন্ত সুস্বাদু। পুরো বছরজুড়ে এ গ্রামের মানুষ শাপলা বিলের শাপলা খেয়ে বাঁচে। বৈশাখ মাসে এ বিলের পাশের মাঠেই বৈশাখি মেলা বসে। শাপলা বিলের পাশের মাঠে মেলা হয় বলে এ মেলার নাম হয়েছে শাপলা মেলা।

শাপলা মেলার মাটির পুতুল এতদঞ্চলে যুগে যুগে নাম কুড়িয়েছে। শাপলাপুরের কুমারদের গত চার পুরুষ ধরে বংশপরম্পরায় মাটির পুতুল তৈরিতে বিশেষ দক্ষতা ও নতুনত্ব পুতুলগুলোকে আশপাশের দশ গ্রামের ছেলে-বুড়োর কাছে সমাদৃত করে তুলেছে। এবারের মেলা বৈশাখের শুরুতেই জমে উঠেছে। দুপুর গড়াতেই শালু বড়ো ভাই শাহেদের সাথে শাপলা মেলায় এসে পৌঁছে। শালুরা যখন মেলায় পৌঁছল তখন মেলায় লোকে লোকারণ্য। নাগরদোলা, মৃত্যুকূপ, রংবেরঙের মাটির পুতুল, ফুলের টব, মোয়া, খই, জিলিপি, বানর নাচ, মোরগ লড়াই, সাপ ও বেজির লড়াই ইত্যাদি শত রকমের মজার মজার জিনিস রয়েছে মেলায়। শালুর মাটির পুতুল খুব পছন্দ। শাহেদ শালুকে বাঘ, জেব্রা, টিয়ে, বনমোরগ ইত্যাদি এক ঝুড়ি মাটির পুতুল কিনে দিল। শালু মনভরে হাওয়ায় মিঠাই ও আইসক্রিম খেল। ছেলেমেয়েরা আনন্দে চিৎকার চেঁচামেচি করছে।

শালু ও শাহেদ যখন নাগরদোলায় চড়ছে, ঠিক তখন মেলা কাঁপিয়ে গুলির আওয়াজ শুরু হলো। ঠা ঠা ঠা ঠা গুলির আওয়াজে মেলার ছেলে-বুড়ো দিকবিদিক দৌড়ে পালাতে লাগল। শালুদের নাগরদোলার দোলনা যখন ঠিক উপরে, নাগরদোলাও আর ঘুরছে না। যে ঘুরাচ্ছিল সে পালিয়েছে। শালু উপর থেকে স্পষ্ট দেখল পড়িমরি করে মানুষের প্রাণভয়ে পালানো। দৌড়াদৌড়ি-হুড়োহুড়িতে হরেকরকমের শত শত মাটির পুতুল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মুহূর্তে মেলা ফাঁকা হয়ে গেল। শাহেদ নাগরদোলার দোলনা নিচে নামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। নাগরদোলার উপরে শালুদের সাথে আরো কয়েকজন আটকা পড়ল। এক পাকিস্তানি ফৌজি নাগরদোলা ঘুরিয়ে উপরের দোলনাগুলো নিচে নামাল। শালুকে রিভলবার হাতে একজন অফিসার ইশারায় ডাকল। শালু ভয় পেল। ভয়ে সে শাহেদের গায়ের সাথে সেঁটে গেল। এবার অফিসার ধমক দিয়ে বলল, 'অ্যাই লড়কি এধার আও।' শালু তবুও গেল না। শাহেদকে জড়িয়ে ধরে রাখল। হঠাৎ এক সিপাহি হ্যাঁচকা টান দিয়ে শাহেদ থেকে শালুকে ছিনিয়ে নিল। সিপাহি শালুকে অফিসারের হাতে তুলে দিল। শাহেদ শালুকে ছাড়ানোর জন্য অফিসারের কাছাকাছি গেলে অফিসার বুট দিয়ে তাকে সজোরে হাঁটুর পেছনে আঘাত করল। শাহেদ বুটের লাথি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। শাহেদ আবার উঠে দাঁড়াল। সাথে সাথে ঠাস ঠাস দুটি রিভলবারের গুলি শাহেদের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। শাহেদের দেহ যখন মাটিতে ধড়ফড় করছে, তখন শালুকে ছ্যাঁচড়ে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদাররা কাজলা নদীর দিকে চলল।

প্রায় এক মাস যাবৎ শালু কাজলা নদীর মাঝ বরাবর ভাসমান পাকিস্তানি ফৌজিদের একটি ছোটো স্টিমারে বন্দি আছে। শাপলা মেলা থেকে তাকে পাক হানাদারের দল স্টিমারে নিয়ে আসে। স্টিমারটির উপরের দিকে দুটি রুম, নিচে চারটি রুম। স্টিমারটি পাক আর্মিদের মোবাইল ক্যাম্প। স্টিমারটি নদীর মাঝে প্রায় সময় স্থির থাকে। গত এক মাসে একবারের জন্যও চলেনি। কেউ ডাঙায় যেতে হলে নৌকো ব্যবহার করতে হয়। অবশ্যই একটি ছোটো নৌকা সবসময় স্টিমারের সাথে বাঁধা থাকে। শালুকে যেদিন এখানে নিয়ে আসা হয়, সেদিন শালু খুব কান্নাকাটি করে। স্টিমারে তাকে নিচের একটি রুমে থাকতে দেওয়া হয়। সেখানে আরো ছয় জন মহিলা রয়েছে। নিজের চোখের সামনে ভাইকে খুন হতে দেখে দশ বছরের শালুর মানসিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। স্টিমারে আসার পর থেকে হাসি নামের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাটি শালুকে বুকে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে। চোখের জল মুছে দিয়েছে। শালু হাসি থেকে জেনেছে, হাসিসহ অন্যান্য মহিলাদেরকেও তার মতো বিভিন্ন জায়গা থেকে পাক হানাদাররা তুলে এনে স্টিমারে বন্দি করে রেখেছে। হাসি স্টিমারের সবার জন্য রান্না করে। রান্না হওয়ার পর খাওয়া পরিবেশনও তার দায়িত্ব। তাই সে নিচতলা-উপরতলা সব জায়গায় বিচরণ করতে পারে। শালুকেও মেজর আসলাম রান্নার কাজে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে। তাই শালু আর হাসি দিনের অধিকাংশ সময় একসাথে থাকতে পারে। শালুও স্টিমারের সব জায়গা বিচরণ করতে পারে। হাসিকে শালু প্রথম প্রথম হাসি আপু ডাকত, পরে আরো সংক্ষেপ করে হাসিপু বলে ডাকতে লাগল।

এই স্টিমারে মোট দশজন পাক ফৌজি রয়েছে। স্টিমারের ডেকের ওপর সার্বক্ষণিক একজন রাইফেল হাতে পাহারায় থাকে। হাসি অত্যন্ত ভীতু। শালু সেদিন বলল, হাসিপু, চলো আমরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যাই। হাসি জিভে কামড় দিয়ে বলল, আরে, পালানোর কথা মুখেও আনবি না। সাথে সাথে গুলি করে দিবে। হাসিকে বন্দি করেছে দু'মাস আগে। স্টিমারটি শাপলাপুরে আসার আগে সবুজডাঙ্গা গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে ছিল। সেখানে মুক্তিবাহিনীর সাথে দুই দফায় যুদ্ধ হয়। দু'বারই মুক্তিবাহিনীর নৌকোকে গ্রেনেড দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসি দু'বারই মুক্তিবাহিনীর সাথে পাক হানাদারদের যুদ্ধ দেখেছে।

শাপলাপুরে পাকবাহিনীর মোবাইল ক্যাম্প স্টিমারটি আসার পর থেকে শাকসবজি, তরিতরকারি, মাছ, ডিম, মুরগি সবগুলো গগন সাপ্লাই দিয়ে আসছে। গগন শালুর স্কুলের বন্ধু। গগন আর শালু পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। গগন তার ছোট্ট ডিঙি নৌকোটি নিয়ে তরিতরকারি খাঁচায় করে স্টিমারে নিয়ে আসে। একটি বড়ো ঝুড়িতে তরিতরকারিগুলো মাথায় করে সে নৌকো থেকে স্টিমারের উপর উঠে আসে। প্রতি সপ্তাহে তিনদিন গগন কাঁচামাল স্টিমারে নিয়ে আসে।

মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য পাক হানাদাররা স্টিমারটি নদীর পাড়ে নোঙর না করে নদীর মাঝখানে নোঙর করে রেখেছে।

গগনকে শালু যেদিন দেখেছিল সেদিন আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল। বলেছিল, গগন, আমাকে তুই এখান থেকে নিয়ে যা। আমি বাড়ি যাব। গগন ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে ইশারায় শালুকে চুপ করতে বলে। শালুর কানে কানে সেদিন গগন বলেছিল, তোরে মুক্ত করব, যদি আমার কথামতো চলিস। যদি আলু দিস তাহলে বাঁচাবো। শালুও কিছু না বুঝে বলেছিল, আচ্ছা, গগন দেব। গগন সেদিনই শালুকে একটু আড়ালে কানে ফিস ফিস করে বলেছিল, সে পিচ্চি গেরিলা। সে সময়মতো এ স্টিমার উড়িয়ে দিবে। তবে তার আগে শালুকেসহ বাঙালি মহিলাদের মুক্ত করবে। সেদিন গগন শালুকে গ্রেনেডের খোঁজ নিতে বলে। গ্রেনেড সম্পর্কে ধারণা দিয়ে বলেছিল, গ্রেনেড দেখতে আলুর মতো। উপরের অংশ লোহার। গগন শালুকে গ্রেনেডকে আলু বলার পরামর্শ দেয়, যাতে পাকবাহিনী শুনলেও বুঝতে না পারে। গগনের সব কথা শুনে শালু সে কথা হাসিকে খুলে বলে। হাসি সব শুনে আবারো ভয় পেয়ে জিভে কামড় দেয়। কিন্তু শালু হাসিকে জড়িয়ে ধরে বলে, হাসিপু, ভয় পেয়ো না। আমাদের যে করে হোক বাঁচতেই হবে।

যে রুমটিতে হাসিরা থাকে সে রুমের পাশের রুমটি সবসময় বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে ফৌজিরা ওই দরজা খুলে আবার বন্ধ করে দেয়। হাসির সন্দেহ হয়, ওই খানেই গোলাবারুদ হয়ত আছে। হাসি বেশ কয়েকদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর ওই দরজা চাপ দিয়েছে, কিন্তু খুলেনি। হাসি জোরে ধাক্কা দেওয়ার সাহস করেনি। বন্ধ রুমটির বিষয়ে হাসি শালুকে আজ জানিয়েছে। শালু ঠিক করেছে আজ রাত গভীর হলে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, তখন তারা দু'জন জোরে ধাক্কা দিয়ে ওই দরজা খোলার চেষ্টা করবে। শালুর খুব আনন্দ লাগছে। আজ সে কাঙ্ক্ষিত 'আলু' হাতে পাবে। গগনকে সে আলু গোপনে দেবে। গগন তাকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

রাত ধীরে ধীরে গভীর হতে লাগল। হাসি ঘুমিয়ে পড়েছে। শালু ধাক্কা দিয়ে হাসির ঘুম ভেঙে দিল। ইশারায় উঠতে বলল। হাসি লাফ দিয়ে উঠে বসল। দু'জনই পাশের দরজাটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দু'জনের চারটি হাত একসাথে দরজায় রেখে এক, দুই, তিন বলে জোরে ধাক্কা দিল। ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে দরজা ক্যাঁচ করে খুলে গেল। ভেতরে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হাসি রান্নাঘরে গিয়ে কুপিবাতি জ্বালিয়ে আনল। কুপিবাতি নিয়ে দু'জনই ভেতরে ঢুকে দেখে, একদিকে কয়েকটি রাইফেল দাঁড় করানো অবস্থায় আছে। অন্যপাশে বেশ কয়েকটি কাঠের কার্টুন রয়েছে। হাসি একটি কাঠের কার্টুনের উপরের ঢাকনি ধরে উপর দিকে টান দিতেই খুলে গেল। কাঠের কার্টুনে থরে থরে গ্রেনেড সাজানো। সে আগেও গ্রেনেড দেখেছে, তাই চিনতে পেরেছে। গ্রেনেডগুলো দেখার সাথে সাথে শালুকে বলল, দেখ, দেখ শালু, এগুলোই আলু। তুই ঝটপট রান্নাঘর থেকে তরকারির একটি ঝুড়ি নিয়ে আয়। শালু দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে একটি ঝুড়ি নিয়ে এল। তারপর টপ-টপ ঐ তরকারির ঝুড়িতে গ্রেনেড রাখতে শুরু করল। শালু সাবধানে গ্রেনেডের ঝুড়িটি রান্নাঘরে লুকিয়ে রাখল।

পরদিন গগন তরকারির খাঁচা নিয়ে স্টিমারে উঠলে শালু দূর থেকে চোখ টিপে দেয়। গগন সাবধান হয়ে যায়। গগন স্টিমারের ডেকের উপরে খাঁচা নামিয়ে রাখল। এক ফৌজি এসে তরকারিগুলো উলটে পালটে দেখল। তারপর কচি লাউ, আলু, কাঁকরোল এবং লালশাকের আঁটিগুলোর মধ্যে অর্ধেক রেখে যেতে বলল। ফৌজির এ আদেশে শালু খুশি হয়ে গেল। গগনকে নিয়ে ডেকের উপর থেকে শালু নিচে রান্নাঘরে গেল। হাসি তাদের পিছু পিছু রান্নাঘরে ঢুকল। শালু ধীরে ধীরে গগনের খাঁচা থেকে তরকারি নামিয়ে ফেলল। গগন কিছু একটা বলতে গেলে শালু ঠোঁটে তার ডান হাতের তর্জনি আঙুল রেখে ইশারায় গগনকে কোনো কথা বলতে নিষেধ করল। শালু আর হাসি রান্নাঘরের কোণে লুকিয়ে রাখা গ্রেনেড ভর্তি ঝুড়িটি বের করে আনল। টপাটপ গ্রেনেডগুলো গগনের তরকারির খাঁচায় রেখে তার উপর লালশাকের আঁটি দিয়ে গ্রেনেডগুলো ঢেকে দিল। গ্রেনেড দেখে গগনের চোখ চকচক করে উঠল। হাসি মুখে শাড়ি চেপে থরথর করে কাঁপছে। গগন শালুকে তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল উঁচিয়ে ইশারায় অভিবাদন জানাল। তারপর সে খাঁচাটি মাথার ওপর নিয়ে স্টিমারের ডেকের ওপর উঠে আসল এবং খুব স্বাভাবিক পায়ে ডেক থেকে নেমে আসল নিজের নৌকায়। গগন বৈঠা হাতে ধীরে ধীরে নৌকা পাড়ের দিকে চালাতে লাগল। স্টিমার থেকে নিরাপদ দূরত্বে এসে সে গলা ছেড়ে গান ধরল।

নৌকো পাড়ে ভিড়ার পর গগন সরাসরি শাপলাবিলের দক্ষিণ পাশে লালকাঁটা বনে চলে গেল। কাঁটার জন্য এ বনে সচরাচর কেউ যায় না। মুক্তিবাহিনী ওই বনকে বেছে নিয়েছে লুকিয়ে থাকার জন্য। ওই বনে ঢোকার নিরাপদ একটি পথ আছে, যা মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ছাড়া আর কেউ জানে না। গগন নিয়মিত ওই বনে ওই পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করে। গগন লালকাঁটা বনে মুক্তিবাহিনীর দলনেতা শাকিলের সামনে তরকারির ঝুড়িটা নামিয়ে লালশাক সরিয়ে গ্রেনেডগুলো দেখাল। গ্রেনেড দেখে শাকিল গগনকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং ঘোষণা দেয়– আগামী বুধবার স্টিমার আক্রমণ হবে।

আজ বুধবার। গগন দুপুরের কিছু আগে তরকারি নিয়ে স্টিমারে আসল। রান্নাঘরে তরকারি রাখতে গিয়ে শালুর কানে কানে বলল, মুক্তিবাহিনীর লিডার শাকিল ভাই বলেছে, আজ রাতে অপারেশন হবে। স্টিমারের দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করা হবে। আক্রমণের আগে আমি উত্তর দিকের পাড় থেকে নৌকো স্টিমারের কাছে আনার সময় বাঁশি বাজাতে থাকব। বাঁশির আওয়াজ শোনার সাথে সাথে তোমরা সবাই তৈরি হয়ে যাবে। দক্ষিণ দিকে গ্রেনেডের প্রথম বিস্ফোরণটা হওয়ার সাথে সাথে সব ফৌজি স্টিমারের দক্ষিণ দিকে মনোনিবেশ করবে। ঠিক তখনি তোমরা দ্রুত উপরে উঠে আমার নৌকোয় নেমে আসবে।

সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ হলো। শালু গগনের পরিকল্পনার কথা স্টিমারে বন্দি সব নারীদের জানিয়েছে। সবাই গগনের বাঁশির আওয়াজের অপেক্ষা করছে। আকাশে চাঁদ নেই। আকাশ ভর্তি তারা। আজকের তারাগুলো আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল মনে হচ্ছে শালুর কাছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দূরে বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেল। সবাই গগনের বাঁশির মনকাড়া মধুর সুর শুনতে লাগল। আর মনে মনে স্টিমার থেকে মুক্তি পাবার জন্য মনকে শক্ত করে নিল। গগনের বাঁশির আওয়াজ ক্রমশ বড়ো হতে লাগল। সবার বুঝতে বাকি রইল না, গগনের নৌকা ক্রমশ স্টিমারের কাছে আসছে। বাঁশির মন ভোলানো আওয়াজে সবাই বিমোহিত। হঠাৎ বিকট একটি শব্দে স্টিমার দুলে উঠল। শালুরা বুঝে গেল গগনের কথামতো দক্ষিণ দিক থেকে স্টিমারের গায়ে গ্রেনেড ফাটিয়েছে মুক্তিবাহিনীরা। শালু ও হাসি স্টিমারের দুলুনিতে দাঁড়ানো থেকে পড়ে গেল। শালু তড়াক করে উঠে সবাইকে ইশারায় স্টিমারের উপরে ওঠার ইশারা করে গটগট করে স্টিমারের ডেকের উপরে উঠতে লাগল। স্টিমারের উপরে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছে। ডেকের উপর উঠেই দেখল– ডেকের উত্তর পাশটায় কোনো ফৌজি নেই। সে নিশ্চিন্ত হলো গগনের কথামতো সেদিকে গ্রেনেড ফাটার সাথে সাথে সেদিকে চলে গেছে। সেদিকেই তারা মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলা করছে। শালু পেছন দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিকে স্টিমার থেকে নামার ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে গগনের নৌকোয় নেমে পড়ল। শালুর পেছন পেছন অন্যরাও গগনের নৌকোয় উঠে পড়ল। গগন দ্রুত নৌকো চালাতে লাগল। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে বৈঠা বাইতে লাগল।

নৌকা যখন পাড়ে ভিড়ল তখন বিকট আওয়াজে স্টিমারে আগুন ধরে গেল। আগুনের দাউ দাউ লেলিহান শিখা আকাশের দিকে লকলক করে বাড়তে লাগল। আগুনের লাল আলোয় নদীর পাড়ও আলোকিত হলো। সে আলোয় সবাই খেয়াল করল– হাসি নৌকায় নেই। সবাই বুঝতে পারল– হাসি ভয়ে স্টিমার থেকে পালায়নি। শালু জলন্ত স্টিমারের দিকে তাকিয়ে হাসিপু হাসিপু করে ডুকরে কেঁদে উঠল। গগনের চোখ ফেটে কান্না এল। নীরবে চোখের জল মুছে শক্ত কণ্ঠে বলল, চল, এখান থেকে দ্রুত সরে পড়তে হবে। গগন দ্রুত পা ফেলে সামনের দিকে হাঁটছে, অন্যরা তার পিছু পিছু হাঁটছে। শালু ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। গগনের চোখও বার বার জলে ভরে উঠছে।

লেখক : কবি, গল্পকার ও সাহিত্যিক এবং সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

শিশু রাসেল

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

অবুঝ শিশু ছোট্ট রাসেল
বিভোর ছিল ঘুমে
ঘুমের ঘোরে গুলির শব্দ
শুনতে পেল রুমে।
বত্রিশ নম্বর বাড়ি তখন
ঘাতক সেনায় ঘেরা
চতুর্দিকে চলছে গুলি
নেই নিরাপদ ডেরা।
বঙ্গবন্ধু হুংকার ছাড়ে
বজ্রকঠিন সুরে
ঘাতকেরা কাঁপতে থাকে
একটুখানিক দূরে।
অকালমৃত্যুর কোলে মুজিব
পড়ল হঠাৎ নুঁয়ে
শোকের ছায়া নামল যেন
বাংলার আকাশ ছুঁয়ে।
ঘাতকচক্র সবাই ছিল
রাজাকারের পক্ষে
খুন থেকে তাই শিশু রাসেল
পেল না শেষ রক্ষে!

নামটি রাসেল তার

বাতেন বাহার

ফুলের মতো একটি শিশু, ফুলের মতো মন
ভাই-ভগ্নী সবার প্রিয়, মায়ের পরম ধন।
মায়ের প্রিয় বাবার প্রিয়, তাই সে চোখের মণি
সবার ছোটো সেই শিশুটি সত্যি সুখের খনি।
ফুলের মতো সেই শিশুটি বাস্তো ভালো ফুল
বাস্তো ভালো আকাশ-নদী, সাদা মেঘের চুল।
রজনিগন্ধা ফুল প্রিয় যার- প্রিয় গোলাপ-বেলি
বনফুলের সৌরভে যে হাসতো হৃদয় মেলি।
ফুলের মতো করত আদর ছোট্ট শিশু পেলে
কাটিয়ে দিত মধুর সময় গল্পে, হেসে খেলে।
সহপাঠীর সুখ-দুখে যে বুঝত মনের কথা
মনের মাঝে করত পোষণ দীপ্ত স্বাধীনতা।
যে শিশুটির ছোট্ট কথা ছোট্ট অনুভূতি
ছড়িয়ে দিত হাজার মনে নতুন আলোর জ্যোতি।
যেই আলোতে হাজার কলি, হাস্তো হাজার প্রাণ
সোনার দেশে সোনার মানুষ– গাইত আলোর গান।
একদিন এক রাতের শেষে– আসবে যখন ভোর
মুয়াজ্জিনের আজান শুনে কাটবে রাতের ঘোর।
তেমনি ক্ষণে গোলাগুলির শব্দে জেগে শোনে
মা, বাবা, ভাই কেউ বেঁচে নেই! পেল আঘাত মনে।
আঘাত সে তো মরণ আঘাত! থামায় কান্না-হাসি
মা ও বাবার মতোই তার থামে প্রাণের বাঁশি।
থামলে বাঁশি কাঁদল আকাশ, ফুল, পাখি, বন, নদী
আজও কাঁদে শিশুর মতো 'বোন'রা নিরবধি।
হাওয়ায় ভাসে যেই শিশুটির হাজার স্মৃতিকথা
বোনের মনে ব্যথার প্রদীপ ছড়ায় নীরবতা।
নীরবতা ছড়ায় যে রে নামটি রাসেল তার
সব ঘাতকের বিচার হলে হাসবে আত্মা যার।

অল্পই অদেখা

কনক চৌধুরী

বেলুনটি উড়ে যেতে যেতে আমার বাগানটি দেখে
নামতে চেয়েছিল
আমি নামতে দিইনি
কতজনে আমাকে অবান্ধব, অ-অতিথিপরায়ণ বলল
কেউ আরো এগিয়ে বলল, অমানুষ।
ওরা জানে না
বাগানে ফুল গাছে সুন্দর সুন্দর ফুল আর পাতাবাহারের মাঝে
ক্যাকটাসও ছিল।

ঋতু কন্যা হেমন্ত

আমিরুল হক

ঋতুচক্রের পালা বদলে/ শরতের বিদায় শেষে
বিভাময় কাশফুল আর/ শিশিরসিক্ত সবুজ কোমল দূর্বাঘাসে
আলতো পা রেখে/ প্রকৃতির মাঝে আসে ঋতু কন্যা হেমন্ত।
স্নিগ্ধ সোনালি রোদের/ ঝলমলে আলোর বিন্যাসে
প্রকৃতি যেন হাসে।
হেমন্তের অপার সৌন্দর্য/ গ্রামবাংলার মানুষের মনটাকে
নানা রঙে রাঙিয়ে তোলে।
সৃজনশীল মানুষের মনপ্রাণকে/ করে উজ্জীবিত।
কৃষকের প্রাণে আনে নতুনের দোলা।
উৎসবমুখর আনন্দ ধারায়/ নবান্ন যেন বেঁচে থাকার
নতুন স্বপ্ন দেখায়/ কৃষকের মুখে ফোটে হাসি।
ঋতু বৈচিত্র্যের খেলায়/ ঋতু কন্যা হেমন্ত লক্ষ্মী যেন এক
অনন্য আসনে আসীন।

বিবেকের ডাক

মনসুর জোয়ারদার

রাখাইনের জমিনে রক্ত ঝরছে/ বর্বরতার কী মহা শিকার!
অস্ত্রবাজদের কৌশল হলো/ রোহিঙ্গাদের নির্মূল করার।
অবৈধ দাবিতে ঘাতক সেনা/ মারছে মানুষ নারী ও শিশু
বিশ্ব বিবেককে ভ্রূকুটি করে/ হামলা করছে রাখাইন পশু!
নিজ দেশে আজ পড়শি হয়ে/ দিন কাটে হায় যাদের দোষে
অন্যায়ের শুরু শেষও আছে/ শুধতে হবেই সে ঋণ শেষে।
সন্ত্রাসী সেনার মদদ পেয়ে/ কতকাল খুনি চোখ পাকাবে?
গুলি-গোলার নিত্য গর্জনে/ আরাকানবাসী কেন ধৈর্য ধরবে?
ওরে যার বুকে অস্ত্র ধরিস/ তারাই তোদের পুরনো দেশি
ইতিহাস আজ উলটাতে গিয়ে/ নিজেরাই হলি চরম দোষী!

অপযুদ্ধের অপবাদে

শাফিকুর রাহী

রাখাইনের রোহিঙ্গারা উখিয়া-টেকনাফে;
স্বজনহারার রোদনধ্বনি নিদারুণ সন্তাপে!
নারী-শিশুর লাশের ওপর ফানুস ওড়ায় কারা?
মিয়ানমারের অত্যাচারী স্বৈরশাসক তারা!
বীর বাঙালির উদার মহৎ অনন্ত উত্থানে;
অমর ত্যাগের বিরলগাথা বিশ্ববাসী জানে!
এশিয়ার এক শান্তিপ্রিয় মানবিক এ দেশে
রোহিঙ্গা আসে রিফুজি হয়ে রক্তবানে ভেসে
সুচি সরকার মানুষ হত্যার জঘন্য সন্ত্রাসে,
অপযুদ্ধের অপবাদে খুনের নেশায় হাসে?
নোবেল জয়ী শান্তির নারী এতোটা জঘন্য?
ধ্বংস করল মানববসত জ্বালালো অরণ্য!
বিশ্ববিবেক বলছে তাকে হও হুঁশিয়ার তুমি
নারী-শিশুর রক্তে ভাসাও মানববসত ভূমি!
লাখো লাখো রোহিঙ্গার বুকভাঙা মাতমে
ধর্ষিতাদের আর্তনাদে পালিয়ে যায় জমে!
বিশ্ববাসী বলছে এখন সুচি মিয়ানমারে
দেশ ছাড়তে বাধ্য করে নির্মম অত্যাচারে!
বিচার হবে হত্যা-গুমের ষড়যন্ত্রকারী
আরাকান-রাখাইনে এখন মুসলিম আহাজারি।
গ্রামের পরে গ্রাম জ্বালালো বসতভিটে উজাড়
সব হারাদের ঠায় মেলে না একটু মাথা গোজার!
আপনজনের রক্তে ভাসে রাখাইন-আরাকানে;
হৃদয়ফাটা রোদন কাঁপে জমিন ও আসমানে!
মিয়ানমারের সমর-জান্তা মাতলো ধ্বংসলীলায়;
সংখ্যালঘু মুসলমানদের বুকে গুলি চালায়!
ঘৃণিত স্বৈরিণী সুচি মানবতা নাশে-
দূর সীমান্ত সাগর-নদী রক্তবানে ভাসে!

তারাও মানুষ

লিলি হক

অগণিত মানুষের কান্না, নারী-শিশু
বৃদ্ধ সব বয়সি মানবসন্তান, লাখ লাখ
রোহিঙ্গা মুসলিম, প্রাণভয়ে বেশিরভাগ
পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশে
লাখো লাখো রোহিঙ্গাকে অন্ন জোগাচ্ছে
মানবিক মূল্যবোধের নজিরবিহীন ভালোবাসা
জননীর মতন ঠাঁই দিয়েছে বাংলাদেশ
গৃহহারা, স্বামীহারা স্ত্রী, বাবা-মা হারানো
অশ্রুসিক্ত শিশু-কিশোর, সন্তান হারানো
বুকফাটা ক্রন্দনে পিতামাতা দিশেহারা
পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল আমার প্রিয় বাংলাদেশ।
মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরাও তো শরণার্থী শিবিরে আশ্রয়
নিয়েছিলাম ঘরবাড়ি, সাজানো সংসার ফেলে, এ শুধু
অনুভব করা যায়, ভাষায় কতটুকু প্রকাশ পাবে জানা নেই ।
আমাদের সাধ্য ও সাধ আছে যতটুকু তাদের পাশে
দাঁড়াবো, দু'মুঠো আহার, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে
আমরাও আজ অতন্দ্র প্রহরী– বিশ্বকে আহ্বান করছি
আসুন আমরা প্রতিহিংসায় নয়, ভালোবাসা দিয়ে রোহিঙ্গা
সমস্যার সমাধান করি সবাই মিলে– কারণ তারাও মানুষ,
তাদের আছে বেঁচে থাকার অধিকার।

অচিন পাখি

জাকির হোসেন চৌধুরী

বুকের ভেতর স্বপ্নগুলো লুকিয়ে রাখি
প্রাণ খুলে সব সত্যি করেও যায় না বলা
ভোরের পাখির পালক দিয়ে আঁকা ছবি
ছবির ভেতর লুকিয়ে আমার অচিন পাখি।
সেই পাখিটা কানে কানে কী বলে যায়–
কেউ বোঝে না ভোরের পাখির চোখের ভাষা
হৃদয়জুড়ে বয়ে বেড়াই কী যন্ত্রণা–
লুকিয়ে রাখি চোখের ভেতর কোন নিরাশা।
একটুখানি সুখানুভব মধুর হাসি–
কখনো বা যায় মিশে ঐ দূর আকাশে
যেমন করে স্নিগ্ধ শিশির জমে থাকে ঘাসে ঘাসে ।
বুকের ওপর চেপে থাকা ভারী পাথর
সরিয়ে দিতে পারি নাতো নিজের হাতে
না পারিতো গাইতে গভীর চাঁদনি রাতে
কী করে সেই পাখির চিবুক। সেই সোহাগে আদর করে।

পৃথিবীর লাশ

সাঈদ তপু

রক্তের জোয়ারে ভাসে লাশের স্তূপ/ ফোরাত থেকে নাফ
ফিলিস্তিন থেকে আরাকান/ তামাম মুসলিম মুলুকে বাজে
গগন বিদারী কান্নার সুর/ তবু বিশ্ব বিবেক আজ চুপ
নির্যাতিতের আওয়াজ/ ফিরে ফিরে আসে বারবার
সব যেন নির্বিকার/ পাষাণে মানুষ বেঁধেছে হিয়া
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে ভাসে/ রাখাইন মার্সিয়া
অসংখ্য ধর্ষিতা নারীর খুন/ আয়নাল কুর্দির মতো
শত শত রোহিঙ্গা শিশুর/ উপুড় হয়ে থাকা গলিত দেহ
যেন উপুড় হয়ে আছে পৃথিবীর লাশ/ বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবা বাদ নেই কেউ
শুধু লাশ, লাশ আর লাশের ঢেউ/ কার উপঢৌকন হিসেবে এত লাশ?
মানুষের লাশের ভিটায়/ কে করবে সর্ষে, মসুর, সূর্যমুখী চাষ?
নাকি মানুষ নির্মূল করে/ এখানে শুরু হবে
দৈত্য, দানব আর/ দাঁতাল শুয়োরের বাস?

আকাশ

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

একদিকে আমি–/ অন্যদিকে তুমি
থমকে আছে স্তব্ধ/ মুখোমুখি-চোখাচোখি
অপরূপের দেখাদেখি।
এ-কোন দৃশ্যাবলি, মুখে নেই ভাষা-/ নেই কোনো প্রকাশ
উদ্ভাসিত মনের আকাশ/ একদিকে তুমি–
অন্যদিকে আমি।
কী মধুর, কী অপরূপ/ মনের নিবিড়, পরতে পরতে
ঘোর লাগা স্বর্গ দোলে–/ উতল মনের বন্ধ কপাট খোলে।

কোথায় মানবতা?

আবু সাঈদ সিদ্দিকী

মানুষ-মানুষের তরে/ ধরণীর' পরে শুনি–
এই জয়গান। যাকে বলে/ মহানুভবতা, মানবিকতা-
মানবতা। তবে কোথায় মানবতা?/ পৃথিবী শাসন করে যারা
তাদের স্বার্থের জন্য মানবতা?/ মানবতার সংজ্ঞা কি এই? যারা
যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে–/ পুরনো অস্ত্রের গুদাম করে খালি,
যাদের জন্য দেশে দেশে নারী-শিশু/ বৃদ্ধের করুণ প্রাণদান!
কে শুনে তাদের আর্তনাদ?/ ধর্ষিত নারী তাদের লুণ্ঠিত
লজ্জা কারে জানায়!/ অগত্যা নিজের জীবন করে বলি।
প্রতিদিন খবরের কাগজে/ ফেসবুক, ইন্টারনেটে
রাশি রাশি বীভৎস চিত্র দেখি।/ বিশ্ব মোড়লেরা খোশগল্প করে
মাঝে মাঝে মানবতার কথা বলে/ মশকারি করে!
তাদের ধামা ধরে যারা–/ তাদেরকে দেয় বড়ো উপহার
শান্তিতে নোবেল পুরস্কার!/ সিরিয়া-ইরাক-আফগানিস্তান-লিবিয়া
ধ্বংস করল কারা?/ দেশে দেশে জঙ্গির জন্মদাতা কারা?
কারা যত্রতত্র বিভুঁই দেশে/ আকাশ থেকে বোমা মারে?
যার জন্য পাপহীন অগণিত/ নারী-শিশু-বৃদ্ধের গলিত
লাশের গন্ধে বাতাস/ হয় ভারী?
যাদের জন্য এত রক্তের/ কাফ্‌ফারা দিতে হয়-
তারাই বিশ্বের মানবতার/ রক্ষাকারী!
আজ মায়ানমারে রাখাইন রাজ্যে/ কী ঘটছে
হাজার হাজার নিরস্ত্র/ মানুষের আর্তনাদ
ভয়ংকর বারুদের ব্যবহার/ আকাশে-আগুনের লেলিহান
শিখা-সামান্য আবাসঘর/ তাও হচ্ছে ছাই।
তাদের কী এ পৃথিবীতে/ এতটুকু বাঁচার অধিকার নাই,
একটুখানি থাকার জায়গা!/ কোথায় মানবতা-?
যে দেশের কর্ণধার/ শান্তিতে নোবেল বিজয়ী!
এই কি শান্তির নিশানা?/ যেখানে দুধের শিশু-
উলঙ্গ মায়ের বুকে/ তৃষ্ণায় করে গড়াগড়ি!
কোথায় শান্তির দূত?/ যারা বিশ্বের মোড়ল-
কেন আজ তারা নিশ্চুপ!/ যে ভিটায় পিতা-পিতামহের
বাস; যাদের বন্ধ করে শ্বাস,/ এই অধিকার হরণকারীর বিশ্ব
সমাজে কি করে ঠাঁই হয়?/ আজ রাখাইন হিন্দু-মুসলিম যাযাবর-
নিরাপদ জায়গা কোথায়?/ বিতাড়িত রোহিঙ্গা তারা কী শুধুই রোহিঙ্গা
না মানুষ? বিধাতার সৃষ্টি কোলে/ কী এতটুকু স্থান নাই!
ওগো বিশ্ব মোড়লেরা-/ তোমরা কোথায়?
তোমাদের কান কি এতই বধির?/ একজন অশীতিপর রোহিঙ্গার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ;
একজন ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না,/ একজন নববধূর সম্ভ্রমহানির জ্বালা অথবা
প্রিয়তম স্বামী হারার বেদনা-/ একজন মায়ের তরুণ ছেলে
হারানো অঝোরে কান্না?/ তোমরা কি এতই বধির-
শুনতে পাওনা? কোথায়/ তোমাদের মানবতা?

সিদ্ধান্ত

রোকসানা গুলশান

হঠাৎ ধাক্কা/ অকস্মাৎ অন্ধকার
আবিষ্কার করি নিজেকে, অনাচারের আবর্জনায়।
আহত মনের পাপড়ির-/ নির্বাক, নীরব।
সংগ্রামী সময়টা পরিত্রাণ খোঁজে/ বিলাপের মূল্য নেই, বিরহেরও
কে পারে সইতে পাথরের এমন ভার ?
সয়ে যায় তবু ক্ষয়ে ক্ষয়ে অনিবার।
আচমকা-/ ফিরে আসে আলো এক
আলো তো একটাই/ ভালো থাকার আলো
পাপড়িরা পেয়ে যায় পাখা/ ভালো থাকাটা একটা সিদ্ধান্তই বটে ;
বিরহ-বিলাপ-শোক-তাপের বৈচিত্র্যে/ বাঁক খুঁজে ফিরে
ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া।

পথিক

খান চমন-ই-এলাহি

বিপদাপন্ন হলে/ একাকী মানুষ চলে
পথ চেনা কিংবা অচেনায়/ জানা কিংবা অজানায়।
সময় গড়িয়ে যায়/ সত্য কিংবা ভুলে যায়
জীবন খুঁজে নেয় নিষ্কৃতি/ আলোর আনন্দ ভুলে।
বাক-নির্বিকারভাবে/ দাঁড়াও পথিক
একদিন খুলে যাবে রহস্যজট/ সত্য কিংবা ভুলের অন্তর্ঘাত।

মায়ের আদর

গোলাম নবী পান্না

মায়ের হাতে রাতের খাবার তারই হাতে দিনের
শোধ হবে না এমন মায়ের আদর মাখা ঋণের।
ক্ষুধায় এ মুখ শুকিয়ে থাকা, লুকিয়ে রাখা হলে
আমার কি আর সাধ্য আছে লুকাবো কোন ছলে?
মুখখানা ঐ দেখে অমন বুঝে ফেলেন মা
তাইতো মাকে ফাঁকি দিয়ে লুকান যায় না।
কাছে ডেকে আদর করে খাইয়ে দিবেন হাতে
ছেলের খাবার দিতে পেরে আনন্দ পান তাতে।
নরম এ ভাত তবুও মা আরো নরম রাখেন
গলায় যেন বেঁধে না যায় আলতো করে মাখেন।
এমনিভাবে সন্তানেরা সুখের ঢেকুর আঁকে
মুখ মুছতেই টেনে ধরে মায়ের আঁচলটাকে।
সেই মাকে এই ভুলে যাবার রীতি যখন দেখি
তখন ভাবি কি আর হবে এমন লেখালেখি।

অন্তহীন

আনসার আনন্দ

এইখানে এক নদী ছিল/ বুকের মধ্যে জোয়ারভাটা
বিষাদ সাগরে দিনরাত্রি/ ভেসে যায় বেহুলার ভেলা–
অদৃশ্য ছায়ায় অন্তহীন/ এই ফুরিয়ে যাওয়া
শেষ দেখা শেষ কথা/ অশ্রুনদী পারাবার...
শূন্য ভিটেয় স্মৃতিরা ডাকে/ ঘরছাড়া বাউল ফেরে না ঘরে।

নিমন্ত্রণ

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

আমার গ্রামে এসো বন্ধু করি নিমন্ত্রণ/ গ্রামটি আমার দেখলে খুশি হবে তোমার মন
সবুজ-শ্যামল মাঠে ভরা/ কৃষক ভাইয়ের লাঙল চড়া
আরো তুমি দেখতে পাবে ছোট্ট একটি নদী/ পালতোলা নাও, কাশের ঝোপ
মাছ ধরিতে মাছের ছোপ/ কত শিশু গিয়ে চরে
নানান রকম খেলা করে/ প্রাণটি ভরে দেখতে পাবে আস তুমি যদি।
সহজ- সরল মানুষগুলি/ বাংলা ভাষা সবার বুলি
কাজটা তাদের নিয়ে ধুলি/ লাঙলটাকে কাঁধে তুলি
ফসল ফলার জন্য ছোটে রৌদ্র ভরা মাঠে/ দেখবে শহর, গাঁ এড়িয়ে
মাঠের পরে মাঠ পেরিয়ে/ বসতে তখন ইচ্ছে হবে সান বাধাঁনো ঘাটে।
পুকুর ভরা নানান মাছে/ পাড়ে ভরা ফলের গাছে
দেখবে আরো ডালে ডালে/ বসছে পাখি পালে পালে
ঠোঁটে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে করছে আলিঙ্গন/ নবান্নেরই দিনে আরো
উৎসবেতে বাড়ি কারো/ মেতে আছে পালা গানে শুনে খুশি মন ।
আমার বাড়ি এলে দেব বসতে শীতল পাটি/ খেতে দেব গাছ কাটা মৌ এক্কেবারে খাঁটি
নিমন্ত্রণ খেয়ে তোমার মনটা যাবে ভরে/ মনে থাকবে গ্রামের কথা সারাজীবন ধরে।

সেই অপরাধী উষা ও শেখ রাসেল

খাইরুল ইসলাম তাজ

পঁচাত্তরের সেই প্রভাত কি আট-দশটা সকালের মতো ছিল ?
সূর্য কি বুঝতে পেরেছিল ঠিক সময়ে আলো ছড়ানোর কথা ?
দখিনা হাওয়া আসি আসি করেও কি অন্য পথে ছুঁয়ে গেল ?
সেদিনের ঢাকা কি আজকের মতোই শশব্যস্ত ছিল না ?
রাসেল বাবু কি বাতায়ন পাশে ভোরের আলোর অপেক্ষায়
জানালার পর্দা সরিয়ে কি পুব আকাশে চোখ রেখেছিল ?
কেমন ছিল তাঁর অনুভূতি? অবিমিশ্র ভয়াল শ্বাপদসংকুল ?
চির পরিচিত ধানমন্ডি কি কিঞ্চিৎ অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল ?
সাত আকাশ ভেদ করে রাসেল কি আল্লাহর আরশ দেখল ?
ঝড়ের আগের ভয়ার্ত পাখির মতো ছুটছিল কি শিশু রাসেল ?
বত্রিশের লেকের জলধারা কি এক সেকেন্ডও থমকে যায়নি ?
একবারও কি থেমে যায়নি রাসেলের প্রিয় গাছটার দোলাদুলি ?
জোনাক পোকার শেষ রাতের আলো একটুও কি নিভে যায়নি ?
সেই ভোরে হয়ত স্বচ্ছ পানির মধুমতিও হতবাক হয়েছিল!
রাসেলের মনে উঁকি দিচ্ছিল কি তমসার এক ঘোর কালো রং ?
উঠোনের ফুল গাছ থেকে কি ঝরে পড়েনি দু-একটি পাপড়ি ?
সেই অপরাধী সকাল, অপরাধী উষা- আর এসো না এই মর্তলোকে
পৃথিবীর সব শিশুদের শৈশব যেন হয়, সোনালি উল্লাসে মাতোয়ারা।

শেখ রাসেলের জন্য

বশিরুজ্জামান বশির

বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াই/ রাসেল কোথায় পাই
শেখ রাসেলের মতো বন্ধু/ আমার যে আর নাই।
রাসেল ছিল রাসেল আছে/ রাসেল মায়ের অন্তরে
রাসেল ছাড়া সমাজ অন্ধ /সমাজে তাই ঘুণ ধরে।
শেখ রাসেলের স্বপ্ন দেখে/ মাতৃভূমির আলো
রাসেল ছাড়া জীবন গড়া/ মন থাকে না ভালো।

ভালোবাসাময় পৃথিবী

কবির আহমেদ

আমার পৃথিবী ভালোবাসাময়/ পিতামাতা, ভাই, বোন, স্ত্রী, সন্তান,
আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী/ সবার প্রতিই আমার অপার ভালোবাসা
ভালোবাসি মানুষকে ভালোবাসি প্রকৃতিকে/ এ দেশ আমার এ পৃথিবী আমার
কোনো কিছুই আমার পর নয়/ সমগ্র জীবনের প্রতি আমার ভালোবাসা
এই ভালোবাসাই আমার শক্তি/স্বপ্ন নয়, স্মৃতি নয়, বিত্ত, বৈভব, উচ্চ অবস্থান
কোন কিছুই আমার ভালোবাসার সমান নয়/ এ শক্তিতে আমি চলি, কথা বলি
বেঁচে আছি, বেঁচে থাকি/ ঐসব মূর্খেরা জানে না ঘৃণা দিয়ে বিদ্বেষ দিয়ে
মানুষকে জয় করা যায় না, বিশ্বকে জয় করা যায় না/ তারা শুধু জানে ঘৃণা-বিদ্বেষ আর
দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করতে/ সুন্দর সুখময় জগৎ সৃষ্টির রহস্য তারা জানে না
তাদের প্রতি আমার আহ্বান/ ভুল পথ ছেড়ে শুদ্ধ পথে চলে এসো
দেখবে পৃথিবী কত সুখময়, স্বপ্নময়/ একমাত্র ভালোবাসাই বাঁচাতে পারে
এ পৃথিবীকে এ পৃথিবীর মানুষ জাতিকে।

জয় হোক মানবতার

তাহমিনা

নিজ দেশে ঠাঁই নেই/ আসছে তারা দলে দলে
প্রাণ বাঁচাতে হায়েনার হাত থেকে।
ওরা রোহিঙ্গা ওরা মানুষ/ মিয়ানমারে এ কোন অশান্তির বারতা
কারা করে দিচ্ছে সবকিছু ছারখার?
জান্তারা জবাই করে, পুড়িয়ে কিংবা গুলিতে করে হত্যা
কী অপরাধ নিষ্পাপ শিশু কিংবা নারী অথবা বৃদ্ধের?
নিজভূম থেকে ওরা আজ পরবাসী/ নেই কোনো অধিকার
নেই খাদ্য, বস্ত্র কিংবা সম্ভ্রম।
বিশ্ব বিবেক আজ কেন নির্বিকার!/ কেউ কি নেই কোথাও?
কোথায় আজ জাতিসংঘ কিংবা ওআইসি?
হে বিশ্ব বিবেক/ বুকে আজ ঠাঁই দাও মানবতা
নিপীড়িত মানুষের কাতারে হও শামিল।
বাঁচাও ওদের, ফিরিয়ে দাও নাগরিক অধিকার/ কেড়ে নাও শান্তির খেতাব অশান্তির রানির।
জয় হোক মানবতার।

একদিন নামিবে আঁধার

জহিরুল হক

একদিন নামিবে আঁধার!/ জ্বলে জ্বলে নিভে যাবে সাধের দু-চোখ!
যতনে গড়া অঙ্গে কোনো সাড়া মিলিবে না!/ বুকফাটা আর্তস্বরে ডেকে যাবে প্রিয়জন:
'কথা কও, কথা কও।'/ কেউ কথা বলিবে না!
কোথা থেকে চলে এসে/ যাবে কে কোথায় চলে?
কেউ তা জানেনি আজও/ কবি কি জেনেছে সবই?
প্যাপিরাসে নাকি লেখা, মনুর নির্বাণের কথা/ সেইসব কথা নিয়ে, কেউ মারে, কেউ মরে!
কেউ কি সত্যি দূরে হাসিছে এসব দেখে?
পৃথিবী ক্ষণিক জানি/ কেন মিছে হানাহানি
মিছে আশা, ভালোবাসা!/ তারপরও ভালোবাসা
এসো না কাছে আসি:/ 'ভালোবাসি!' 'ভালোবাসি!'
'আজ নয় কাল হবে...'/ 'কেন আজ নয় তবে?'
শারদ শেফালির মতো/ তুমি-আমি ঝরে যাব!
তারপরে আর নেই!/ কিছু নেই! কেউ নেই!

সরকারি হলো বিরামপুর কলেজ

ডা. নূরল হক

বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ এবং একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি কলেজটি সম্প্রতি সরকারিকরণ হয়েছে। এ পর্যায়ে ১১ই মে ২০১৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ বরাবর কলেজের ৩৬.০৮ একর জমিসহ সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য 'ডিড অফ গিফট' অর্থাৎ 'দানপত্র' দলিল সম্পন্ন হয়েছে। বিরামপুর কলেজটি সরকারিকরণের ঘোষণায় সকলের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এলাকার সকল স্তরের জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক বিশাল আনন্দ মিছিলও বের হয়। প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে ২৯১টি উপজেলার মধ্যে কলেজ নেই– এরমধ্যে থেকে প্রস্তাবিত ২৭৫টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় অনাপত্তি জ্ঞাপনের ফলে কলেজটি সরকারিকরণ করা হলো।

কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মো. ফরহাদ হোসেন ২০১৪ সালে স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য মো. শিবলী সাদিকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর সরকারিকরণের জন্য আবেদন করেন। ৬ই এপ্রিল ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৭ই মে ২০১৫ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালককে সরেজমিনে কলেজটি পরিদর্শন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। এরপর ১১ই জুন ২০১৫ তারিখে সরকারিকরণের যৌক্তিকতা যাচাই করার জন্য মাউশির মহাপরিচালক পরিদর্শন টিমকে নির্দেশ প্রদান করলে ১৮ই জুন ২০১৫ তারিখে পরিদর্শক টিম কলেজটি পরিদর্শন করে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন জমা দেয়। কলেজটি সরকারি হওয়ার ফলে শিক্ষকসহ কর্মচারীরা যেমন কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাবেন, তেমনি দরিদ্র শিক্ষার্থীরা স্বল্প বেতনে এ প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে।

দিনাজপুর জেলা সদর থেকে ৫৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত বিরামপুর স্থানটি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ একটি অগ্রসর উপজেলা। ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনাসহ দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে বিরামপুরের সরাসরি রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। এটি উপজেলা হলেও রাস্তাঘাট, দোকানপাট, ঘরবাড়ি এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি যে-কোনো জেলা সদরের সমপর্যায়ভুক্ত। বিরামপুর পৌরসভার দক্ষিণ প্রান্তে বিরামপুর-ঢাকা মহাসড়কের পূর্বপাশে ২৬ একর জমির ওপর বিরামপুর কলেজটি অবস্থিত। এছাড়া সাগাইঘাটা, একইর ও কেটরা মৌজায় ১০ একর ফসলি জমি রয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এলাকার অবহেলিত ও দরিদ্র সন্তানদের মাঝে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ও হাকিমপুর থানার শিক্ষানুরাগী গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ও দানশীল ব্যক্তিদের উদ্যোগে এবং সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই বিরামপুর কলেজের যাত্রা শুরু হয়। এ অঞ্চলের মুরুব্বি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের আরবি অধ্যাপক মাওলানা অ্যাডভোকেট তছির উদ্দিনকে অধ্যক্ষ এবং ফুলবাড়ি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক এবং ভাইস প্রিন্সিপাল আব্দুল গফুরকে উপাধ্যক্ষ করে মানবিক ও বাণিজ্য শাখা চালুর মাধ্যমে কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৮ সালের ৩রা নভেম্বর বর্তমান স্থানে কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বিরামপুর কলেজ স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাবেক বিরামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মরহুম ফজলার রহমান মণ্ডল। তিনি প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজের অফিস পরিচালনার জন্য তার বাসগৃহ ছেড়ে দেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ করে বশির উদ্দিন সরকার ও রহমতুল্লাহ মাস্টার নিঃস্বার্থভাবে শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেন।

১৯৬৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৭২ সালে ডিগ্রি পাস কোর্স, ১৯৮৫ সালে বিএসসি, ১৯৯৫ সালে বিএম শিক্ষাক্রম এবং বর্তমান অধ্যক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং শিক্ষকদের সহযোগিতায় ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিরামপুর কলেজে বাংলা ও ব্যবস্থাপনায় স্নাতক সম্মান কোর্স চালু হয়। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার কোনো ইউনিয়নে এটাই প্রথম কলেজ।

কলেজের নিজস্ব জমি থেকে দানকৃত একটা অংশে বিরামপুর উপজেলা পরিষদ এবং বিরামপুর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিরামপুর কলেজিয়েট হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত। কলেজ ক্যাম্পাসের বর্তমান ২৬.০৮ একর স্থানের একটা অংশে রয়েছে কলেজের অবকাঠামোসহ বিশাল খেলার মাঠ। ক্যাম্পাসের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে কলেজের আওতাধীন মার্কেট ও মসজিদ এবং বাকি অংশে একটি পুকুর ও একটি নিজস্ব গভীর নলকূপ রয়েছে। কলেজ সীমানার পূর্বপ্রান্তে রয়েছে ফসলি জমি যেখানে ধানসহ বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ফসল উৎপাদন হয়। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ফলজ ও বনজ কাঠের গাছ। কলেজের মূল ভবনের এক অংশে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অফিস কক্ষ, অন্য অংশে কলেজ অফিস ও শিক্ষক মিলনায়তন, বিশ্রামাগার, গ্রন্থাগার, সেমিনার কক্ষ, ৭টি গবেষণাগার, ১৯টি শ্রেণিকক্ষ এবং বিজ্ঞান ভবনে ৩টি বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ২টি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। ২০১৫ সালে বঙ্গবন্ধু ভবনের নিচতলায় হলরুম নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন ভবনের পূর্ব পাশে রয়েছে রোভারডেন ও খেলাঘর এবং মূল ভবনের পশ্চিমে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্মিত হয়েছে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য সাইকেল ও মটর সাইকেল শেড। এছাড়াও ছাত্রদের জন্য নির্মিত ছাত্রাবাসে ডাইনিং রুমসহ ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। এতে ৪০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় ১০৪৩ জন, ডিগ্রি পাস কোর্সে ১৮৮৮ জন, স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ২০৭ জন এবং বিএম শিক্ষাক্রমে ২৬২ জনসহ প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। মোট শিক্ষক/কর্মচারী ৭৬ জন।

কলেজটি চার উপজেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। প্রতিবছর আশপাশের উপজেলার বিভিন্ন উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরিতে প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সরকার কলেজটি জাতীয়করণের মাধ্যমে এলাকার জনগণের বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ করেছে।

লেখক : চিকিৎসক ও সাংবাদিক

বিশেষ প্রতিবেদন

দিনাজপুরে পাঠক-লেখকদের আড্ডা এবং গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময়

মো. সাদ্দাম হোসেন

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ সকাল ৯টায় দিনাজপুর সার্কিট হাউসে *সচিত্র বাংলাদেশ* ও *নবারুণ* পত্রিকার পাঠক-লেখকদের সাথে আড্ডা হয়েছে। আড্ডায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন, জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলম, *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, সিনিয়র তথ্য অফিসার মো. তৌফিকুল ইসলাম, রিজ স্কুলের অধ্যক্ষ মো. শফিকুল ইসলাম, কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. রাহিনুর ইসলাম, হোসেনপুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. মোনায়েম খান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট-এর সাধারণ সম্পাদক সুলতান কামাল উদ্দিন বাচ্চু, আমাদের থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক তারিকুজ্জামান তারেক, *দৈনিক খবর একদিন* পত্রিকার সম্পাদক মোফাসিরুল রাশেদ, দিনাজপুর আইটি'র পরিচালক মো. সাদ্দাম হোসেনসহ প্রায় ৪৫ জন পাঠক-লেখক উপস্থিত ছিলেন। প্রাণবন্ত এ আড্ডায় স্কুল ছাত্র জিমু খান, সায়েম মোস্তাফিজ তৃপ্ত, মো. আফরিদ খানসহ পাঠক-লেখকগণ মতামত প্রকাশ করেন। আড্ডায় পত্রিকা দুটির প্রচার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি, লেখক সম্মানী বৃদ্ধি, জেলা-উপজেলায় পাঠক ফোরাম গঠন এবং বিভিন্ন পত্রিকার স্টলে পত্রিকা দুটি বিক্রির ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর সিনিয়র সাবএডিটর সুলতানা বেগম, সাবএডিটর সাবিনা ইয়াসমিন, ডিএফপি'র আর্টিস্ট কাম লে-আউট এক্সপার্ট মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন, ফটোগ্রাফার মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর দিনাজপুর জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময়

২৮শে সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টায় উত্তরবাংলা পত্রিকার কার্যালয়ে পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণ উদ্‌বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি। সাথে রয়েছেন ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

৩০শে সেপ্টেম্বর দিনাজপুর সার্কিট হাউসে লেখক-পাঠক আড্ডায় বক্তব্য রাখছেন জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলম, পাশে উপবিষ্ট ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

এর আগে ২৮শে সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে তথ্য অধিকার আইন এবং সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন। জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলম-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রেস ক্লাবের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক-বার্তা সম্পাদক, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ শতাধিক মিডিয়া কর্মী উপস্থিত ছিলেন। মিডিয়া কর্মীদের মধ্য থেকে প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী দুলাল, প্রবীণ সাংবাদিক ও *দৈনিক তিস্তা*'র সম্পাদক মিজানুর রহমান লুলু, *দৈনিক উত্তরা*'র সম্পাদক অধ্যাপক মুহম্মদ মহসিন, *আলোকিত বাংলাদেশ*-এর প্রতিনিধি কামরুল হুদা হেলাল, সাংবাদিক ইউনিয়ন সভাপতি ওয়াহেদুল আলম আর্টিস্ট ও সাধারণ সম্পাদক শাহিন হোসেন, *দৈনিক ইত্তেফাক* ও বিটিভি প্রতিনিধি মো. মতিউর রহমান, শামীম রেজা, শাহাদাৎ হোসেন শাহ, ফটো-সাংবাদিক মো. নুরুল ইসলাম প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টায় *উত্তরবাংলা* পত্রিকার কার্যালয়ে পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণ উদ্‌বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমপি। অনুষ্ঠানে সহ-উদ্‌বোধক ছিলেন ডিএফপি'র মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন। পরে তিনি (ডিজি, ডিএফপি) দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত ৯টি দৈনিক পত্রিকার অফিস পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁকে সহযোগিতা করেন ডিএফপি'র পরিদর্শক মো. খোরশেদ আলম।

২৯শে সেপ্টেম্বর দিনাজপুরে হাকিমপুর প্রেস ক্লাবে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রবীণ সাংবাদিক

২৯শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় হাকিমপুর প্রেস ক্লাবে এবং বিকাল ৫টায় ফুলবাড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর মহাপরিচালক। হাকিমপুর প্রেস ক্লাবে মতবিনিময় সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার শুকরিয়া পারভীন, প্রেস ক্লাবের সভাপতি দেলওয়ার হোসেনসহ প্রায় ২৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। ফুলবাড়িতে মতবিনিময়কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুস সালাম মণ্ডল, *সাপ্তাহিক দেশ মা*'র সম্পাদক অমর চাঁদ গুপ্ত অপু, *দৈনিক আমাদের সময়*-এর প্রতিনিধি ওয়াহিদুল ইসলাম ডিফেন্স এবং ফুলবাড়ি প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রথমবারের মতো ডিএফপি'র মহাপরিচালকের উপজেলা প্রেস ক্লাবে আগমনকে সাধুবাদ জানিয়ে উভয় সভায় সাংবাদিকগণ নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।

লেখক: পরিচালক, দিনাজপুর আইটি এবং ফটোফিচার : মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় 1st OIC Summit on Science and Technology-এ অংশগ্রহণকারীদের সাথে ফটোসেশনে যোগ দেন –পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরা নিশ্চিত করতে হবে

মিয়ানমারের জাতিগত বা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওআইসি'র সদস্যদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। তিনি বলেন, নিজ দেশে রোহিঙ্গাদের ওপর বারংবার অত্যাচারের ফলে তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। রোহিঙ্গারা যাতে নিজেদের আবাসভূমিতে ফিরতে পারে তা নিশ্চিত করতে মুসলিম বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

১০ই সেপ্টেম্বর কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর শীর্ষ সংগঠন ওআইসি'র প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, রোহিঙ্গাদের সুরক্ষার জন্য আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নাগরিকত্বের অধিকারসহ সব ধরনের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। এই জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সংকট, নিষ্ঠুরতা এবং উৎখাতের শিকার। তিনি আরো বলেন, হাজার হাজার রোহিঙ্গা সীমান্ত পার হয়ে ঢুকে পড়ায় বাংলাদেশ এ সমস্যায় সরাসরি আক্রান্ত। বাংলাদেশ মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। মিয়ানমারের এই সমস্যাকে এমনভাবে সমাধান করতে হবে যাতে রোহিঙ্গারা নিজের ভূমি রাখাইনে নিরাপত্তা এবং মর্যাদার সঙ্গে ফিরে গিয়ে থাকতে পারে। মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের একই নেটওয়ার্কের আওতায় কমপক্ষে ১০ বছর মেয়াদি কর্মসূচি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বিশ্বের মধ্যে মুসলমানদের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সহায়ক হবে।

কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজারবায়েভের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ওআইসি'র সামিট চেয়ার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মামনুর হুসাইন, ওআইসি'র সেক্রেটারি জেনারেল ইউসেফ বিন আহম আল-ওসাইমিন বক্তব্য দেন। সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই সেপ্টেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১০ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ একটি দেশ ও জনগণের সম্পদ। তাই বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান প্রধামনন্ত্রী। তিনি বিদ্যুতের অপচয় রোধে সবাইকে বিদ্যুতের প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের অনুরোধ জানান। এছাড়া অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট নর্থ কম্বাইন্ড সাইকল, সিম্পল সাইকল প্লান্ট (উত্তর) এবং ১০৮ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কেরানীগঞ্জ ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ভারতের ত্রিপুরা থেকে রেডিয়াল মোডে অতিরিক্ত ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বল্প খরচে উন্নতমানের নিরবচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশনের কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্‌বোধন করেন। এর মাধ্যমে ১৫০০ গিগাবাইট পার সেকেন্ড ডাটা আদান-প্রদান সম্ভব হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী পটুয়াখালী জেলায় এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন অনেকগুলো প্রকল্পেরও উদ্‌বোধন করেন।

উখিয়ার রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার উখিয়া কুতুপালং রোহিঙ্গা শিবিরে মিয়ানমার থেকে আশ্রয়ের জন্য আসা জনগণের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে রোহিঙ্গা জনগণের ওপর অমানবিক আচরণ এবং অন্যায়-অত্যাচার বন্ধ করে প্রতিবেশী মিয়ানমারের প্রতি বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী আধ ঘণ্টা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বার বার আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং প্রত্যেকের কাছে তাঁর সান্ত্বনার বাণী পৌঁছে দেন।

জাতিসংঘের ৭২তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'UN Secretary General's High Level Panel on Women's Economic Empowerment for Leaving No one Behind' *শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন –পিআইডি*

পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। নিউইয়র্ক যাওয়ার পথে তিনি আবুধাবী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি রাত্রিযাপন করেন এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের সংস্কার বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তেসোরিং তোবগের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী মহাকাশে বাংলাদেশ যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে তা থেকে সেবা প্রদানের অনুরোধ জানান এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল থেকে ব্যান্ডউইথ সেবা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গেও বৈঠক করেন। বৈঠকে শেখ হাসিনা ফিলিস্তিনের জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকার প্রশংসা করেন। একই দিন প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল চেম্বারে যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ ও অপব্যবহার বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের মাঝে যৌন অপরাধ নির্মূলে জাতিসংঘের মহাসচিবের যথাযথ পদক্ষেপের প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ভিকটিম সাপোর্ট ফান্ডে ১ লাখ ডলার প্রতীকী চাঁদার ঘোষণা দেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী কনবেরি কনফারেন্স সেন্টারে 'গ্লোবাল ডিল ফর ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইনক্লুসিভ গ্রোথ' বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক ফলোআপ বৈঠকে যোগ দেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ওআইসি কন্ট্রাক্ট গ্রুপের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবং রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে মুসলিম দেশগুলোকে ৬ দফা প্রস্তাব দেন। প্রধানমন্ত্রী 'উইমেন্স ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট ফর লিভিং নো ওয়ান বিহাইন্ড'- এর ওপর জাতিসংঘ মহাসচিবের উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক করেন। এছাড়া অধিবেশনে যোগদানকারী রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মানে জেনারেল অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং-এ জাতিসংঘ মহাসচিব আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দেন। ২০শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কের গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে বিজনেস কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং (বিসিআইইউ) আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দেন এবং আমেরিকার শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী এস্তোনিয়ার প্রেসিডেন্ট কার্স্টি কালজুলাইদ-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'ক্রিয়েটিং দ্য পলিসি ভিশন ফর এসডিজি ফিন্যান্স ফ্যাসিলিটেটিং প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য এসডিজি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী এবং এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়নের ঘাটতি মোকাবিলায় বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি পানি সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের চতুর্থ সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং পানি সম্পদ ও ব্যবস্থাপনা খাতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে পানি সংক্রান্ত গবেষণা কাজ এবং উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি স্থানান্তরে একটি বৈশ্বিক তহবিল গঠনে তাঁর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। ২১শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের রাখাইনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নসহ সুনির্দিষ্ট ৫টি প্রস্তাব পেশ করেন। ভাষণ প্রদানের পর প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং সম্মেলন শেষে ভার্জিনিয়ার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন। **প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের ওপর OIC Contact Group-*এর সভায় অংশগ্রহণ করেন –পিআইডি*

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

সাংবাদিকরা গণতন্ত্রে প্রহরীর ভূমিকা পালন করেন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২৯শে আগস্ট রাজধানীর পিআইবি মিলনায়তনে পিআইবি এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচির উদ্যোগে সাংবাদিকতা শেখার ই-লার্নিং প্লাটফর্ম 'অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম' উদ্‌বোধনকালে বলেন, সাংবাদিকরা গণতন্ত্রে প্রহরীর ভূমিকা পালন করেন। তাই নীতি ও গণতন্ত্রে তাদের অটল থাকতে হবে। সাংবাদিকরা গণমাধ্যমের পবিত্রতা রক্ষা করবেন। মিথ্যাচার, তথ্য বিকৃতি, অপসাংবাদিকতা, পোষা-সাংবাদিকতা থেকে দূরে থাকতে তিনি আহ্বান জানান।

নারী উন্নয়নে দেশের উন্নয়ন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২৬শে সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ আয়োজিত 'প্রোগ্রেসিভ অ্যাওয়ার্ড ২০১৫ ও ২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে বলেন, নারীদের পর্যাপ্ত উদ্যোগেই পারে দেশের অর্থনীতিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দিতে। মন্ত্রী আরো বলেন, 'নারীর উন্নয়নের অর্থ দেশের উন্নয়ন। মনে রাখতে হবে, সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম অধিকার নিশ্চিত করার মধ্যেই দেশের সত্যিকার উন্নয়ন নিহিত।'

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে রোহিঙ্গা বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা কামরুন নাহার এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

জাতিসংঘের মাধ্যমে মিয়ানমারের গণহত্যার তদন্তের দাবি

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৮ই সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের পিআইডি মিলনায়তনে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মিয়ানমারে যে গণহত্যা চলছে, সে বিষয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি জাতিসংঘের প্রতিনিধির রাখাইন রাজ্য পরিদর্শন, আনান কমিশনের সুপারিশগুলো পূর্ণ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়াসহ কয়েকটি দাবি জানান।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সরকার মানবিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক –এই তিন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। মানবিক পদক্ষেপ হিসেবে ২২ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মানবিক এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে কক্সবাজারে ১৪টি পয়েন্টে রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য ও অর্থ দেওয়া, ২ হাজার একর জমিতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য অস্থায়ী আবাসন নির্মাণ, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া, নিরাপত্তার জন্য ১৫টি চৌকি স্থাপন, ৪২টি ভ্রাম্যমাণ নিরাপত্তা টহল দল পরিচালনা, শিশুদের জন্য টিকা ও ভিটামিন সরবরাহ ইত্যাদি। এছাড়া গর্ভবতী ও স্তনদানকারী মিলিয়ে ৭০ হাজার মায়ের জন্য বিশেষ পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। **প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন**

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন

২রা সেপ্টেম্বর : ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ত্যাগের মহিমায় উৎসবমুখর পরিবেশে সারাদেশে পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত

৮ই সেপ্টেম্বর : 'সাক্ষরতা অর্জন করি, ডিজিটাল বিশ্ব গড়ি' –প্রতিপাদ্য নিয়ে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস।

আন্তর্জাতিক আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস

১০ই সেপ্টেম্বর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে '১৫তম আন্তর্জাতিক আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস ২০১৭'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'টেক এ মিনিট, চেঞ্জ এ লাইফ'।

শিক্ষা দিবস পালিত

১৭ই সেপ্টেম্বর : সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় ' শিক্ষা দিবস'। এবারের শিক্ষা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'মানবতার স্বপক্ষে, মানবাধিকার সুরক্ষায় মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা'।

বিশ্ব শান্তি দিবস

২১শে সেপ্টেম্বর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব শান্তি দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'শান্তির জন্য ঐক্য: সবার জন্য শ্রদ্ধা, নিরাপত্তা ও একাগ্রতা'।

বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস

২২শে সেপ্টেম্বর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত দিবস'। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'যানজট ও দূষণমুক্ত নগরায়ণে প্রয়োজন গণপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ'।

প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

অপারেশন জ্যাকপট

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ১০নং সেক্টর বা নৌ সেক্টর কর্তৃক 'অপারেশন জ্যাকপট' ১৯৭১-এর ১৫ই আগস্ট রাত ১২টার পর অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট প্রথম প্রহরে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর এবং দেশের অভ্যন্তরে চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে একই সময়ে পরিচালিত হয়। এই গেরিলা অপারেশনে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেকগুলো অস্ত্র ও রসদবাহী জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বড়ো রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজগুলোর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্যকারী অনেকগুলো বিদেশি জাহাজও থাকায় এই অপারেশন বাংলাদেশের যুদ্ধ এবং যোদ্ধাদেরকে সারাবিশ্বে পরিচিতি পাইয়ে দেয়।

প্রতিবেদন : মো. লিয়াকত হোসেন

হানাদারদের নৃশংস নির্যাতন ও আমার বাবার মৃত্যু

২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। ভোরে বিকট শব্দ শুনে আমাদের সকলের ঘুম ভেঙে যায়। অবশ্য আমার বাবা তখন অতটা গুরুত্ব দেয়নি। বাবা ভেবেছিল যে, আগের মতো হয়ত আমাদের ভয় দেখানোর জন্য ফাঁকা গুলি করা হচ্ছে। অথবা আমাদের ছেলেরা যে সমস্ত বোমা তৈরি করেছিল, সেগুলোই হয়ত বিস্ফোরিত করছে। ২৫শে মার্চ সারা রাত আজিমপুর কলোনির ছেলেরা বড়ো বড়ো আম, জাম, সাজনা গাছ কেটে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছিল, পাকসেনারা যেন আজিমপুর কলোনিতে প্রবেশ করতে না পারে। সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যবর্তী সময়ে জানালা দিয়ে লক্ষ করলাম যে, কলোনির ৪৫নং বিল্ডিং-এর সামনে বাবা ও ছেলেদের ধরে বাইরে আনা হচ্ছে এবং তাদেরকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করছে। একজন একজন করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। আর বর্বর পাকবাহিনী চিৎকার করে গালি দিচ্ছে 'শালা তোম জয় বাংলা বলতা, বাইনচোত পতাকা ফেক দো...'। তারপর আমাদের ৭৫নং বিল্ডিংয়ের সামনে পাকবাহিনীর গাড়ি এসে থামল। বাবা প্রতিটি মুহূর্ত আতঙ্কের সাথে বাসায় পায়চারি করছে। বাবা আমাদের খাটের তলায় লুকিয়ে পড়তে বলল। মা আমাদের নিয়ে খাটের তলায়। হঠাৎ দরজায় লাথি। বাবা দরজা খুলতেই পাকসেনারা পেটাতে শুরু করল। খাটের তলা থেকে কালো কালো বুট জুতা দেখা যাচ্ছিল। বাবা ব্যথায় চিৎকার করছিল। মা আমাদের দুই ভাইয়ের মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরেছে, আমাদের কান্নার আওয়াজ যাতে শোনা না যায়। পরে শুনেছি, আমাদের বিল্ডিং-এর ফিরোজ ভাই, তিনি সাহস করে বিল্ডিংয়ের ছাদে উঠে যান এবং ছাদ থেকে বাংলাদেশের পতাকাটা পাক সৈন্যদের গাড়ির সামনে ফেলে দেন, যার জন্য সেদিন বিল্ডিংয়ের অনেকের জীবন বেঁচে যায়। পাকিস্তানিরা তাকে গুলি করে আর বলতে থাকে, 'সাব্বাস ব্যাটা, সাব্বাস'। ভাগ্যিস ফিরোজ ভাইয়ের গায়ে সেদিন গুলি লাগে নাই। তিনি বেঁচে যান। পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে যায়। আমার বাবা অজ্ঞান হয়ে দরজার সামনে পড়েছিল। তার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরুচ্ছিল। আমাদের পাশের বাসায় একজন ডাক্তার থাকতেন। হাসান ভাইয়ের বাবা। তিনি তাড়াতাড়ি গরম পানি আর ডেটল দিয়ে ক্ষতস্থানের রক্ত মুছে পরিষ্কার করেন। তিনিই তার চিকিৎসা করছিলেন। সেই যে আমার বাবা বিছানায় পড়লেন আর তিনি উঠে দাঁড়াতে পারেননি। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হলো এক নদী রক্তের বিনিময়ে। ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে বেলা ৪টার সময় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী নিঃশর্তভাবে।

মহান ১৬ই ডিসেম্বরের পর স্বজনহারা জনগণের বুকফাটা আর্তনাদে ভরে উঠল আকাশ-বাতাস। মমতাময়ী জননী পর্যন্ত ব্যর্থ হয় নিজ সন্তানের গলিত দেহ শনাক্ত করতে । আর আমার মা বাবাকে নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন চিকিৎসার জন্য। বাবা ২ বছর ৩ মাস ১৮ দিন মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করে ১৯৭৩ সালের ১৪ই জুলাই চলে গেলেন না ফেরার দেশে। আর পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ভারতে চলে গেল মিত্রবাহিনীর হেফাজতে। **প্রতিবেদন : সৈয়দ মাসুদ হোসেন**

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা সূচকে ৭ ধাপ এগিয়ে

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF)-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর 'বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচক ২০১৭' শীর্ষক প্রতিবেদনের জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে ৭ ধাপ এগিয়েছে। গত বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৬। এ বছর হয়েছে ৯৯তম। ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এটি প্রকাশ করেছে সিডিপি। প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রথম অবস্থানে আছে সুইজারল্যান্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সিঙ্গাপুর।

চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রকল্প

চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৫ হাজার ৬১৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় খাল খনন ও সম্প্রসারণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। এতে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশন হবে।

পদ্মা সেতুর বাস্তব রূপ লাভ

নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ ফিরিয়ে দিয়ে বর্তমান সরকার শক্ত মনোবল ও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পদ্মা সেতুর কাজ। এতদিন নদী শাসনসহ সেতুর অনান্য কাজ হয়েছে। অবশেষে দৃশ্যমান হলো পদ্মা সেতুর অংশ। ৩০শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা ২৮মিনিটে বসানো হয় দেশের সবচেয়ে বড়ো অবকাঠামো পদ্মা সেতুর প্রথম স্প্যান। ৪২টি পিলারে তৈরি পদ্মা সেতু হবে ৬ দশমিক ১৫ কিমি. দীর্ঘ। ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পদ্মা সেতুর কাজ ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে বলে আসা করা যাচ্ছে। সেতু বিভাগের তথ্যানুযায়ী, প্রকল্পে এ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৪৯ শতাংশ।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

১৭ প্রকল্পে ৩৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেবে ভারত

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, রেলপথ, সড়ক, জাহাজ চলাচল ও বন্দর অবকাঠামোসহ ১৭টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে ভারত। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই অর্থের পরিমাণ ৩৬ হাজার কোটি টাকা। দেশের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম ঋণচুক্তি। ভারতের কোনো দেশকে দেওয়া এটিই সর্বোচ্চ ঋণ। ৪ঠা অক্টোবর অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ও বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

রোহিঙ্গা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ৫ দফার সঙ্গে একমত জাতিসংঘ

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া পাঁচ দফা প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে জাতিসংঘ। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ বিষয়গুলো নিয়ে জাতিসংঘ সব সময় বলে আসছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

২২শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে আয়োজিত নিয়মিত ব্রিফিং-এ জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এসব কথা জানান। **প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন**

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সিলেট এমসি ও সরকারি কলেজে দুটি ১০ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৬শে আগস্ট সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এমসি ও সরকারি কলেজের ১০তলা একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন প্রজন্ম মেধার দিক দিয়ে দরিদ্র নয়, দিন দিন এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি হচ্ছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার মানও বাড়ছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী সিলেট সরকারি কলেজে ৫টি বিষয়ে অনার্স চালুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও দেন।

ময়মনসিংহে দেশের ১১তম শিক্ষা বোর্ড গঠন

ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলা নিয়ে দেশের ১১তম শিক্ষা বোর্ড গঠন করেছে সরকার। 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ' নামে নতুন এই বোর্ড স্থাপনে ২৮শে আগস্ট আদেশ জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ। ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন অর্ডিনেন্সের ক্ষমতাবলে সরকার ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও জামালপুর জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ শহরে এই শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করেছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৫শে সেপ্টেম্বর কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে তাঁর অফিস কক্ষে ই-ফাইলিং কার্যক্রম -এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বর্তমান সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ।

শিক্ষা ডিরেক্টরি অ্যাপ ও অনলাইন EIIN কার্যক্রম -এর উদ্‌বোধন

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৫শে সেপ্টেম্বর ব্যানবেইস সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কর্তৃক দেশের প্রথম শিক্ষা ডিরেক্টরি অ্যাপ ও অনলাইনে ইআইআইএন কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (EIIN) পেতে এখন আর ঢাকায় আসতে হবে না। অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমেই তা পাওয়া যাবে। **প্রতিবেদন : মো. সেলিম**

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধী শ্রমিকরাও অবদান রাখছেন বাংলাদেশের উন্নয়নে

প্রতিবন্ধী শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। আশুলিয়ার গণকবাড়ির পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে (সিআরপি) প্রতিবন্ধীদের মার্কস অ্যান্ড স্টার্ট প্রজেক্টের ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শনের সময় ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী এ কথা বলেন। এ সময় তিনি সিআরপিতে প্রশিক্ষণ নেওয়া বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার গল্প শোনেন।

প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসায় ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল

প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়ে আসছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন'। প্রতিবন্ধীসহ প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য ভ্রাম্যমাণ গাড়ি এখন জেলার বিভিন্ন উপজেলায় যাচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সেবার গাড়িতে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপি সহকারীসহ মোট আটজনের টিম রয়েছে।

প্রতিবেদন : হাছিনা আক্তার

শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

আরো ১০ উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতের আওতায়

২০২১ সালের মধ্যে দেশের সব মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসার অংশ হিসেবে আরো ১০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় এসেছে। ১০ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকল (নর্থ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিপুরা থেকে অতিরিক্ত ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি এবং ১০ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা জায়, ইতোপূর্বে দেশের ১৬টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় এসেছে। আরো ৩৫টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন হতে যাচ্ছে খুব শিগ্‌গির। এছাড়া এ অর্থবছরে ৪৬০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় আনার সম্ভাবনা রয়েছে। ১০ তারিখে যে ১০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে সেগুলো হলো– বাগেরহাটের মোল্লাহাট ও ফকিরহাট, দিনাজপুরের হাকিমপুর, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর, সিলেটের সদর ও ফেঞ্চুগঞ্জ, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা, কিশোরগঞ্জের ভৈরব, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও নরসিংদী সদর উপজেলা।

সৌর বিদ্যুৎ এবার জাতীয় গ্রিডে

জামালপুরের সরিষাবাড়ীর সিমলা বাজার এলাকায় ৮ একর জায়গাজুড়ে স্থাপিত হয়েছে দেশের প্রথম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যা এখন জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। ৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে প্রবেশ করেছে 'এনগ্রিন সরিষাবাড়ী সোলার প্ল্যান্ট লিমিটেড ' নামের এ কেন্দ্রটি। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

নির্যাতিত নারীদের ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসা বিষয়ে খসড়া নীতিমালা তৈরি

ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসা বিষয়ে আদালতের রুলের পরিপ্রেক্ষিতে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি হয়েছে।

খসড়ায় বলা হয়, ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার পর শারীরিক পরীক্ষার সময় ভিকটিমের সঙ্গে অবশ্যই নারী পুলিশ পাঠাতে হবে। নারী পুলিশ না থাকলে অভিভাবক, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার বা বেসরকারি সংস্থার একজন নারী প্রতিনিধিকে পাঠাতে হবে। ডাক্তারি পরীক্ষার সময় ভুক্তভোগীর যথাযথ গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে। খসড়ায় আরো বলা হয়, ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার নারী ও কন্যাশিশুর জন্য মানহানিকর প্রশ্ন করা থেকে আসামিপক্ষের আইনজীবীকে বিরত থাকতে হবে।

প্রতি উপজেলায় পুষ্টিবিদ নিয়োগ হবে

সরকার প্রতি উপজেলায় একজন করে পুষ্টিবিদ নিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে পুষ্টি চালের কার্যকারিতা বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ তথ্য জানান।

রোহিঙ্গাদের সেবায় ১০৯টি মেডিক্যাল টিম

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবায় স্বাস্থ্য বিভাগের ১০৯টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। ১২ই সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইলের মধুপুর ও ঘাটাইল উপজেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এ কথা জানান। **প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন**

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

কক্সবাজারে হচ্ছে ঝিনুক আকৃতির রেলওয়ে স্টেশন

দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার – ঘুনধুম রেললাইন প্রকল্পের আওতায় ঝিনুক আকৃতির বিশ্বমানের একটি রেলস্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু হবে আগামী মাসেই। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আট অগ্রাধিকার প্রকল্পের একটি। এ রেলস্টেশনটির কাজ শেষ হবে ২০২২ সালের মধ্যে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-ঘুনধুম রেললাইন স্থাপিত হলে যোগাযোগসহ দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। ব্রডগেজসহ ডুয়েল লাইনের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে এ প্রকল্পটি।

রেল সূত্রে জানা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পর্যটক আকর্ষণ করতেই এই আইকনিক ইন্টারন্যাশনাল রেলস্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ঝিনুক আকৃতির এই রেলস্টেশন দেখলেই বোঝা যাবে এটি সমুদ্রসৈকতের স্টেশন। স্টেশনটির অবস্থান হবে কক্সবাজার বাস টার্মিনালের বিপরীতে চৌধুরীপাড়ায়। এ প্রকল্পে দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার এবং রামু থেকে ঘুনধুম পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটার– এই মোট ১২৮ কিলোমিটার নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ হবে।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

তিন শিল্পী পেলেন নজরুল পুরস্কার

নজরুল সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য শিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরা ও শিল্পী ফেরদৌস আরা এবং নজরুল সংগীত নিয়ে গবেষণার জন্য শিল্পী লীনা তাপসী খান পেলেন ২০১৬ সালের নজরুল পুরস্কার। জাতীয় কবির ৪১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ২৭শে আগস্ট জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও নজরুল পুরস্কারের আয়োজন করে নজরুল ইনস্টিটিউট।

আজীবন সম্মাননা পেলেন শিল্পী খুরশীদ আলম

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মঞ্চে ছয় ঋতুর রাগসংগীত দিয়ে শুরু হয় ১২তম চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড ২০১৭। এ বছর আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হন বাংলা গানের কিংবদন্তী মোহাম্মদ খুরশীদ আলম। **প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

ডিজিটাল বাংলাদেশ

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে রপ্তানি বেড়েছে সাড়ে পাঁচ গুণ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর তথ্য মতে, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কম্পিউটার সার্ভিসে ২৫ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আর গত ছয় বছরে এ খাতের রপ্তানি আয় সাড়ে পাঁচ গুণ বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধারা অব্যাহত থাকলে পোশাকশিল্পের মতো তথ্যপ্রযুক্তি খাতও রপ্তানি আয়ের একটি বড়ো উৎস হিসেবে দাঁড়াবে।

শেয়ার লেনদেনে জনপ্রিয় হচ্ছে মোবাইল অ্যাপস

নব্বইয়ের দশকে পুঁজিবাজারে কাগুজে শেয়ার লেনদেন হতো। বর্তমান সরকারের সময় শেষের দিকে কাগুজে শেয়ারকে বিদায় জানিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শেয়ার লেনদেন চালু হয়। প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নয়নে এখন পরিশ্রম ছাড়াই ইন্টারনেট সংযুক্তি আর স্মার্টফোনের মাধ্যমে ঘরে বসেই শেয়ার লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মোবাইল অ্যাপস 'ডিএসই-মোবাইল'। **প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফফাত আঁখি**

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রণোদনা পাবেন সাড়ে ৫ লাখ কৃষক

সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বিভিন্ন জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি কৃষির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে কৃষি প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। এরই আওতায় আসন্ন মৌসুমে বিনামূল্যে ৫ লাখ ৪১ হাজার ২০১ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ৫৮ কোটি ৭৭ লাখ ১৯ হাজার ৩১৫ টাকার বীজ ও সার দেওয়া হবে। ১০ই সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। **প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা**

বন্যাপরবর্তী সময়ে কৃষক ভাইদের করণীয়

দেশের কোথাও না কোথাও প্রতিবছরই বর্ষাকালে বন্যা দেখা দেয় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে। সাম্প্রতিক বন্যায় দেশে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এমতাবস্থায় ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কৃষক ভাইদের জন্য কিছু করণীয় বিষয় হচ্ছে :

* বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা আংশিক হয়েছে এমন জমির ক্ষেত্রে বন্যার পানিতে ভেসে আসা কচুরিপানা, পলি, বালি এবং আবর্জনা যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করতে হবে।

* বন্যার পানি সরে যাওয়ার পরও ৫-৭ দিন কাদাযুক্ত ধান গাছ পরিষ্কার পানি দিয়ে, প্রয়োজনে স্প্রে মেশিন দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

* পানি নেমে যাওয়ার পরপরই সার প্রয়োগ করা ঠিক নয়, এতে ধান গাছ পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

* পানি নেমে যাওয়ার ১০ দিন পর ধানের চারায় নতুন পাতা গজানো শুরু হলে বিঘা প্রতি ৮ কেজি ইউরিয়া ও ৮ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

* উঁচু জমিতে যেখানে বন্যার পানি উঠেনি সেখানে রোপণকৃত বাড়ন্ত আমন ধান গাছ (রোপণের ৩০-৪০ দিন পর) থেকে ২-৩টি কুশি রেখে বাকি কুশি সযত্নে শিকড়সহ তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য ক্ষেতে রোপণ করতে হবে।

* যেসব এলাকা বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার কারণে বীজতলা করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে ভাসমান বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদন করতে হবে।

* ব্রি উদ্ভাবিত আলোক সংবেদনশীল উফশি জাত যেমন- বিআর ৫, বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান ৩৪, ব্রি ধান ৪৬, ব্রি ধান ৪৫ এবং নাজিরশাইলসহ স্থানীয় জাতসমূহ রোপণ করতে হবে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর। এছাড়া ব্রি উদ্ভাবিত স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন জাত ব্রি ধান ৫৭ ও ব্রি ধান ৬২ রোপণ করা যেতে পারে।

* উল্লিখিত জাতসমূহ নাবীতে রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা ৪-৫টি এবং রোপণ দূরত্ব ২০-২৫ সেন্টিমিটার।

* বিলম্ব রোপণের ফলে দ্রুত কুশি উৎপাদনের জন্য সুপারিশকৃত টিএসপি, জিপসাম ও জিংকসহ ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) ইউরিয়া জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া রোপণের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

* যেসব এলাকা পুনরায় বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম (উঁচু ও মধ্যম উঁচু) সেসব জমিতে অঙ্কুরিত বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে বপন করতে হবে। সেক্ষেত্রে রোপণ পদ্ধতির চেয়ে ৫-৭ দিন আগাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

* বন্যার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া ধান গাছের যাবতীয় পরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, পোকামাকড় ও রোগাক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা, সুষম পরিমাণে সার প্রয়োগ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

* বন্যা পরবর্তী সময়ে চারাগাছ সম্পূর্ণভাবে মাটিতে লেগে যাওয়ার সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ৬০ গ্রাম পটাশ সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

* এ সময় গাছের মাজরা, বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো এবং পামরি পোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য পোকা বিশেষে হাত জাল, পার্চিং এবং প্রয়োজন হলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

* দেশের উত্তরাঞ্চলে আগাম শীত আসার কারণে ১৫ই সেপ্টেম্বর এবং মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে ২০শে সেপ্টেম্বরের পর আমন ধান রোপণ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে আগাম রবি ফসলের আবাদ করতে হবে।

এছাড়া বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। কৃষিবিষয়ক তথ্য পেতে যে-কোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩ নাম্বারে ফোন করতে পারেন কৃষক।

প্রতিবেদন : শান্তা ইসলাম

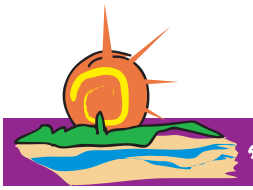

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

পলিথিন বিরোধী অভিযান জোরদার করার সিদ্ধান্ত

পলিথিন ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে পলিথিনের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় প্রকাশিত পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অধিদপ্তরের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ৩৮টি অভিযান পরিচালনা করেছে। সাত বছরে এই বিভাগের অধীনে ভ্রাম্যমাণ আদালত ১২৫টি অভিযান পরিচালনা ও মোট দেড় কোটি টাকার বেশি জরিমানা আদায় করেছে।

বিশ্ব নদী দিবস

নদী সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রোববার পালিত হয় বিশ্ব নদী দিবস। এ উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রোববার বিশ্ব নদী দিবস হিসেবে পালন করতে শুরু করে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া (বিসি) ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে পালিত হয় দিবসটি। বাংলাদেশে ২০১০ সাল থেকে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস

পৃথিবীর ওজোন স্তর রক্ষার্থে বিশ্বের জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৬ই সেপ্টেম্বর পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'নিরাপদ সূর্যালোকে যতনে থাকিবে প্রাণ'। **প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন**

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ওয়াসফিয়ার পিকো দেওরিজাবা জয়

মেক্সিকোর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ও উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি পিকো দেওরিজাবা জয় করলেন বাংলাদেশের এভারেস্ট জয়ী দ্বিতীয় নারী ওয়াসফিয়া নাজরীন। প্রথম এবং একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে ওয়াসফিয়া এই সুউচ্চ আগ্নেয়গিরি জয় করেন। উত্তরের পথ দিয়ে ২৪শে আগস্ট ওয়াসফিয়া পিকো দেওরিজাবার চূড়ায় পৌঁছান। এটি ট্রান্স-মেক্সিকোর আগ্নেয় বেল্টের পূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫ হাজার ৬৩৬ মিটার উঁচু। মেক্সিকোর যে তিনটি আগ্নেয়গিরিতে এখনো হিমবাহ আছে এর মধ্যে পিকো দেওরিজাবা একটি।

সিঙ্গাপুর পাচ্ছে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

সিঙ্গাপুরে প্রথমবারের মতো একজন নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন । তিনি হচ্ছেন সেখানকার পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকার হালিমা ইয়াকুব। তিনি সংখ্যালঘু মুসলিম মালয় গ্রুপের সদস্য। এদিকে ১৫ই সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের নবনির্বাচিত প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হালিমা ইয়াকুবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মোঃ আবদুল হামিদ।

নারীদের নৌকাবাইচ

নারীদের নৌকাবাইচে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সুচিত্রা বিশ্বাসের দল গানের পাখি। নড়াইলের রূপগঞ্জ সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ মাঠে ৬ থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এস এম সুলতান মেলা। মেলার শেষদিনে আয়োজন করা হয় এ নৌকাবাইচ। পুরুষদের পাশাপাশি এখানে নারীদের আলাদা নৌকাবাইচ হচ্ছে ছয় বছর ধরে। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

কুমিল্লায় ফুটবল ঐতিহ্য

সারাবিশ্বে ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা। যাদের পদচারণায় সারাদেশ শুধু নয়, পাক-ভারত উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছিল কুমিল্লার ফুটবলের ঐতিহ্য, তারা শুধু পরিবার থেকেই সাহায্য-সহযোগিতা কিংবা উৎসাহ পেতেন না, স্কুল বা কলেজে পড়াকালীন লেখাধুলা শিক্ষকের কাছে যৎসামান্য প্রশিক্ষণে একেকজন হয়েছিলেন উপমহাদেশের কিংবদন্তি। তাদের ছিল না কোনো বিশেষ দলের কোচের কাছে বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও। শুধু একাগ্রতা আর নিষ্ঠার জন্যই সেটা সম্ভব হয়েছিল। এমনই একজন আদর্শ ফুটবলার ছিলেন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ের সূর্য দত্ত। যার নাম দেশ, উপমহাদেশ ছাড়িয়ে বিশ্ব দরবারে উঠেছিল। তিনি

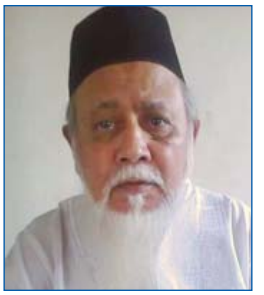

সাবেক জাতীয় ফুটবলার হুমায়ুন কবীর

১৯৫৭ সালে চট্টগ্রামে ট্রাফিক স্পোর্টস ক্লাব ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন দলের সাথে হুমায়ুন কবীর (সামনে সর্ব বায়ে)

ভারতের জাতীয় দলের প্রতিনিধি হয়ে ৭ বার খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরকম এক বা দু'জন গোল্ডেন ফুটবলার বৃহত্তর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করলেও কুমিল্লা বা এদেশের ফুটবলপ্রেমীদের কেউ তাদের মনে রাখেনি। এরকমই আর একজন গোল্ডেন ফুটবলার ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে–পরের বৃহত্তর কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাজু ঘোষ। ১৯৩৮ সালে ইংল্যান্ড থেকে 'করোনথিয়ান্স' নামের একটি ফুটবল দল বিশ্ব ভ্রমণে বের হয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষের কুমিল্লায় এসেছিল। সেসময় টমসম ব্রিজ এলাকার একটি মাঠে কুমিল্লা দলের সাথে খেলেছিল ইংল্যান্ডের সেই দলটি। বিশ্ববিখ্যাত সেই দলটি কুমিল্লা একাদশের সাথে তখন ৪-২ গোলে জিতেছিল। কুমিল্লার পক্ষে গোল করেছিলেন আব্দুল জলিল ও রুনু। ওই দলটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৮৭টি ম্যাচ খেলেছিল। কোরিয়া এবং ভারতের কলকাতা মোহামেডানের বিরুদ্ধে দুটি খেলায় ড্রসহ একটি ম্যাচ হেরেছিল ঢাকা একাদশের সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বিদেশি আরো ২/৩টা ফুটবল দল এসেছিল কুমিল্লায়। তার একটি ছিল নাইন হানড্রেড উইনস। ইংল্যান্ড থেকে আসা ওই দলটির সঙ্গে ছিল ডেনিস কম্পটন। তিনি ইংল্যান্ডের পক্ষে খেলতেন। লেফট উইং পজিশনে খেলা ওই ফুটবলার ক্রিকেটও খেলতেন। তিনি কুমিল্লা পলোগ্রাউন্ডে (বর্তমান কুমিল্লা স্টেডিয়াম)-এ ফুটবলের কিছু ডেমোনেস্ট্রেশন দেখিয়েছিলেন। তিনি সেসময় এক বা দুটি ম্যাচ খেলেছিলেন কুমিল্লা ফুটবল একাদশের সঙ্গে। কুমিল্লার তৎকালীন ফুটবলাররা তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল সেই দলটির সাথে। তারপর এসেছিল আরো একটি দল। এ দলটির নাম ছিল সি সি টি এফ। এর পরে আরো একটি দল এসেছিল। নাম ছিল সানরাইজ। আমাদের দামাল ছেলেরা তখন সমানে সমান লড়েছিল তাদের সাথে। এসময় কুমিল্লার উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হলেন– ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিরাজউদ্দিন, কুমিল্লার দাউদকান্দির খন্দকার নাসিম, ছোটো রশিদ, চাঁদপুরের জি পাল, সূর্য দত্ত, রাজু ঘোষ, ক্যাপ্টেন দত্ত, বি রায়, গোলকিপার মোসলেহ উদ্দিন, ভোলা বর্ধন, হাজী রমিজ, ছোটরার আব্দুল জলিল, পাখি সেন, ফরিদ উদ্দিন, তমিজউদ্দিন, উপেন্দ্র দরবারী, ঈসমাইল খাঁন, জীতু ঘোষ প্রমুখ। যাদের দাপটে কুমিল্লার বাইরে কলকাতা ফুটবলও তখন সমৃদ্ধ হয়েছিল। তার পরবর্তী সময়ে মহিউদ্দিন, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল জব্বার, মহারাজ মতি মিয়া, জালাল প্রমুখ নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। এরপর ৫০ দশকের শুরুতে বলাই দাস, মদন দাস, শাহ আলম, আশরাফ, হুমায়ুন কবীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুবল দাস, নুরু ভূইয়া, নোয়াব আলী, মৌলভী আবুল খায়ের, নজির আহমেদ, আমান চৌধুরী, মাখন সেন, গাজিউল হক, ধনু মিঞা, শিবলী নোমানী, কায়কোবাদ, জহির, দিলীপ বাদল, রঞ্জিত, আমানুল্লাহ (গোলকিপার) প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত খেলোয়াড়; যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছেন। কুমিল্লার এই ফুটবল গৌরব ছিল বিগত শতাব্দীর ৮০ দশক পর্যন্ত। নিঃস্বার্থ ফুটবলপ্রেমী পৃষ্ঠপোষকদের হাত ধরে বিগত সময়ে কুমিল্লার ফুটবল অনেক উঁচুতে স্থান নিয়েছিল। যার ফলে অনেক বিদেশি দল এখানে এসে কুমিল্লা একাদশ এর সাথে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীতার মুখোমুখি হয়েছিল। যেমন ১৯৫৫ সালে ভারতের কলকাতা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কুমিল্লা একাদশের সাথে ৩-০ গোলে হেরে গিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে কলকাতার আরেক স্বনামধন্য ক্লাব মোহামেডান ৫-৪ গোলে জিতেছিল। এছাড়াও করাচি কিকার্স, বেলুচিস্তান একাদশের মতো দলও এই মাঠে পরাজিত হয়েছিল। এর বাইরে ১৯৫৬, '৬০, '৬৪ সালে ৩ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল কুমিল্লা। আর এর পেছনে মূল অবদান ছিল কুমিল্লার নিঃস্বার্থ ফুটবলপ্রেমীদের। **প্রতিবেদন : হুমায়ুন কবির, সাবেক জাতীয় ফুটবলার**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শন

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী এম এ তাহেরের 'বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' শীর্ষক দুই সপ্তাহব্যাপী একক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। প্রদর্শনীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১২টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (চাক, মুরং, পাংখোয়া, খুমি, খেয়াং, বোম, লুসাই, উসাই, ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা, তংচঙ্গ্যা) দৈনন্দিন জীবন, কর্ম ও প্রকৃতির প্রায় ৮০টি আলোকচিত্র স্থান পায়। প্রদর্শনীটি ১৮ থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। **প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন**

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

চট্টগ্রাম শহরের ১০৭টি সড়ক সংস্কারের উদ্যোগ

ভারি বৃষ্টিপাত এবং পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলে ও জোয়ারে ক্ষতিগ্রস্ত বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সড়কগুলোর সংস্কারের প্রকল্পে প্রায় ৬৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ১০৭টি সড়কের সংস্কারে এ অর্থ ব্যয় হবে। এসব সড়কের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৭ কিলোমিটার। এর পাশাপাশি জলাবদ্ধতা কমিয়ে আনতে বেশ কয়েকটি ব্রিজও নির্মাণ করা হবে।

এ প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে– ১৩৬ দশমিক ১০কিমি. দৈর্ঘ্যের ১০৭টি রাস্তার উন্নয়ন, ৩৬টি ব্রিজ নির্মাণ, ১৩৮ দশমিক ৭৪ কিলোমিটার বিদ্যুতায়ন ও এক্সিলেটরসহ (চলন্ত সিঁড়ি) ৪টি ফুটওভার ব্রিজ স্থাপন। এছাড়া ৪টি ড্রাম্প ট্রাক, ২টি ১০ টন ওজনের রোড রোলার, ২টি পে-লোডার, ১টি কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি এবং ১টি পানিবাহী ট্রাক ক্রয় করা হবে।

খুলনা–সাতক্ষীরা মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত হচ্ছে

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হতে যাচ্ছে। জনগুরুত্বপূর্ণ খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কটি চার লেনে উন্নীত হচ্ছে। জিরো পয়েন্ট থেকে আঠারো মাইল পর্যন্ত ২৮ কিমি. খুলনা-সাতক্ষীরা সড়কটি পরিপূর্ণভাবে প্রশস্তকরণের মধ্য দিয়ে দুই লেনে এবং শহরকেন্দ্রিক ময়লাপোতা থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ৩ কিমি. সড়কটি চার লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা হবে। সড়কটি উন্নীত হলে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরের সঙ্গে খুলনাসহ সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সহজ হবে।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে কলেজে ক্লাস নেওয়ার সুপারিশ

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে সকল কলেজে সপ্তাহে অন্তত একদিন এক ঘণ্টার ক্লাস নেওয়ার সুপারিশ করেছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই সুপারিশ করা হয়। কমিটির সভাপতি রেবেকা মমিন বলেন, সপ্তাহে অন্তত এক ঘণ্টা ক্লাস নেওয়ার যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতে শুধু বাল্যবিবাহ নয়, নারী নির্যাতন নিয়েও আলোচনা হবে।

রোহিঙ্গা এতিম শিশুদের স্মার্টকার্ড প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের এতিম শিশুদের স্মার্টকার্ড প্রদান শুরু করেছে। এজন্য শুন্য থেকে ১৮ বছর বয়সি সকল এতিম শিশু-কিশোরদের আলাদা থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে।

৭০ হাজার রোহিঙ্গা শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, সরকারি উদ্যোগে ত্রাণ তৎপরতার পাশাপাশি বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের চিকিৎসায় মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে বিশেষ ইপিআই কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭০ হাজার রোহিঙ্গা শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ও 'হাম রুবেলা' টিকা প্রদান করা হয়েছে। **প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন**

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সিলেটে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তৈরি হচ্ছে 'বীর নিবাস'

সিলেটজুড়ে বিভিন্ন উপজেলায় বর্তমান সরকার ভূমিহীন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৬৫টি বসতঘর নির্মাণ করছে। ইতোপূর্বে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৪৯টি ঘর নির্মাণ করে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। আরো ১৬টি লাল-সবুজের 'বীর নিবাসের' কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

৮০২ জন পেল বিভিন্ন ভাতার কার্ড

কুষ্টিয়া সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে ৮০২ জনের মধ্যে বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড বিতরণ করা হয়েছে । জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব উল আলম হানিফ কুষ্টিয়া পৌরসভার ২১টি ওয়ার্ডে এসব কার্ড বিতরণ করেন। **প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ**

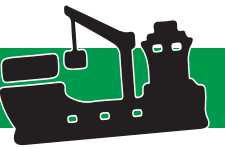

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

শুল্ক সংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে

ব্যবসায়ীরা এখন থেকে সব ধরনের পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্কের (কাস্টমস) তথ্য পাবেন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) শুল্ক সংক্রান্ত এই সেবা চালু করেছে। ২০শে সেপ্টেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এ ওয়েবসাইটের উদ্‌বোধন করেন। নতুন ওয়েবসাইটের ঠিকানা : www.bangladeshcustoms.gov.bd। ওয়েবসাইট থেকে আমদানিকারকরা শুল্ক ও ব্যবসা সংক্রান্ত সব তথ্য পাবেন।

চা রপ্তানিতে বিস্ময়কর সাফল্য

চা রপ্তানিতে অভাবনীয় গতি এসেছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেই চা রপ্তানি আয় পুরো অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ

চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাস (জুলাই-আগস্ট) রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৬৬২ কোটি ৮৬ লাখ ডলার। যা গত অর্থবছরে একই সময় ছিল ৫৮২ কোটি ২৯ লাখ ডলার। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ। পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ। ১০ই সেপ্টেম্বর রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা যায়। **প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে**

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

রুখে দাঁড়াতে হবে মাদকের বিরুদ্ধে

সম্প্রতি রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে 'মাদকবিরোধী সেরা প্রতিবেদন ও স্টিকার প্রতিযোগিতা পুরস্কার ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। মাদক নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও টেলিভিশনে প্রচারিত প্রতিবেদন থেকে তিনজন করে ছয়জনকে 'সেরা প্রতিবেদন' পুরস্কার এবং তিনজনকে 'সেরা স্টিকার' পুরস্কার দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পুরস্কারের জন্য সংবাদপত্র বিভাগে ৩২টি, টেলিভিশন বিভাগে ৯টি এবং সেরা স্টিকারের দৌড়ে অংশ নিতে দেড় হাজারের বেশি স্টিকার জমা পড়েছিল। দেশের যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করতে ২০১০ সাল থেকে এই পুরস্কার দিচ্ছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। এ বছর এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় নগদ অর্থ, সনদ এবং মেডেল। **প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন**

ধূমপান মাদকাসক্তির দুয়ার

মাদকের ছোবলে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আজ বিশ্বে লাখ লাখ তরুণ বিপন্ন, বিধ্বস্ত, অন্ধকারে দিনাতিপাত করছে। ফেসবুকে প্রচারিত এক যুবকের আর্তনাদ– 'হে সৃষ্টিকর্তা মাদকের কারণে আমার অপরাধের শাস্তির অর্ধেক আমার বন্ধুদের দাও'! কী এক কঠিন অবস্থায় পড়লে একজন তরুণের এমন মনের অবস্থা হতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি মাদক সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আগামী ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ধূমপায়ী বা মাদকাসক্তরা মেডিক্যাল শিক্ষায় ঢুকতে পারবে না। এজন্য শিক্ষার্থীকে ভর্তির সময় ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়ে প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। ঠিক কেন এই সিদ্ধান্ত এবং এর বাস্তবায়ন কীভাবে করা হবে– একথা জিজ্ঞেস করা হলে মন্ত্রী বলেন, ধূমপান এবং মাদকাসক্তিকে নিরুৎসাহিত করতেই এই পদক্ষেপ। তিনি বলেন, 'শুধু ভর্তি পরীক্ষায় পাস করলেই হবে না তাকে একটি প্রত্যয়নপত্র দেখাতে হবে যে সে ধূমপায়ী বা মাদকাসক্ত নয়'।

কু-অভ্যাসের মধ্যে ধূমপান বা মাদকাক্তসক্তি বর্তমান সময়ের এক বড়ো সমস্যা। আসুন সকলে মিলে সরকারের পাশাপাশি যার যার অবস্থান থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সচেতনতা সৃষ্টি করি। সকলে সিগারেট ও মাদকদ্রব্য বর্জন করি। **প্রতিবেদন : মোহাম্মদ হাসান জাফরী**

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

নির্মাতা মাসুদ পথিক 'ঋত্বিক ঘটক স্মৃতি পুরস্কার' পেলেন

কবি ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা মাসুদ পথিককে কলকাতার ইলিশ ও পর্যটন উৎসব কমিটি প্রদান করেছে 'ঋত্বিক ঘটক স্মৃতি পুরস্কার'।

কলকাতায় আবারো সেরা অভিনেত্রী জয়া আহসান

আবারো প্রশংসায় ভাসছেন দুই বাংলার গুণী অভিনেত্রী জয়া আহসান। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুয়েটসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ক্যালেডোস্কোপ ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন তিনি। কলকাতার কৌশিক গাংগুলির *বিসর্জন* ছবির জন্য এ স্বীকৃতি পান তিনি। তিনদিনের উৎসবটি শুরু হয় ৮ই সেপ্টেম্বর। এছাড়া এই ছবির জন্য ইন্টারন্যাশনাল বেঙ্গলি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডে (আইবিএফএ) সমালোচনা বিভাগে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান অভিনেত্রী জয়া আহসান। **প্রতিবেদন : মিতা খান।**

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

সাফ অনূর্ধ্ব ১৮ ফুটবলে বাংলাদেশ রানার্স-আপ

সম্প্রতি ভুটানে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব ফুটবলের রানার্স-আপ হয়েছে বাংলাদেশ। ভারতকে ২-০ গোলে হারিয়ে সমান পয়েন্ট পেয়েও হেড টু হেডে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল নেপাল। ২৮শে সেপ্টেম্বর ভুটানের থিম্পুতে শেষ হয়ে গেল 'সাফ অনূর্ধ্ব ১৮' ফুটবল

সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত-বাংলাদেশ খেলার একটি মুহূর্ত

চ্যাম্পিয়নশিপ। সাফের প্রথম (২০১৫ সালে এটা ছিল সাফ অনূর্ধ্ব ১৯) আসরে কাঠমাণ্ডুতে ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন হয় নেপাল।

প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজংগী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এসকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 38, No. 04, October 2017, Tk. 25.00

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকগণ দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ
অক্টোবর ২০১৭ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৪

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে, কিনবে
লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস ।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd